বিশেষ দ্রষ্টব্য

তারাপদ রায়কে.

১

'আমি আপনার চোখ চাইনা। কিন্তু, আপনার সঙ্গে একবার চোখাচোখি দেখা করার সুযোগ পেতে পারি কি ?' এই চিঠিটা লিখেছিলাম একটি বিজ্ঞাপনের উত্তরে। ইংরেজি দৈনিকে একজন বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, তিনি তাঁর একটি চোখ দান করতে চান। যার দরকার সে বিজ্ঞাপনদাতার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। বিজ্ঞাপনটি বেরিয়েছিল বক্স নাম্বারে, উত্তর পেলাম একজন বাঙালির কাছ থেকে। শনিবার সন্ধেবেলা আমাকে দেখা করতে বলেছেন।

দক্ষিণ কলকাতার নব্য-ধনী এলাকার একটি চারতলা বাড়ির একেবারে চারতলার ঘরে তিনি আমার সঙ্গে দেখা করলেন। দীর্ঘ সুঠাম চেহারা, বয়স পঞ্চাশের বেশি নয়, দেখলেই লোকটিকে বেশ রাশভারী মনে হয়। ঘরে একটি শ্বেতপাথরের টেবিল, একটি চেয়ার ও খাট ছাড়া কোন আসবাব নেই। সবকিছুই সাদা। সাদা বিছানার চাদর, সাদা জানালার পর্দা, ধপধপে সাদা দেয়ালে একটি ছবি বা ক্যালেন্ডারও নেই। অত সাদা রং চোখকে পীড়া দেয়। ঘরটা দেখেই আমার অপ্রাসঙ্গিকভাবে মনে পড়ল, কবি ইয়েটস নাকি সবসময় কালো রং ব্যবহার করতেন, কালো পোশাক, কালো পর্দা — এমনকি চা খেতেন কালো কাপ-ডিশে, পাশে একটি কালো বিড়াল নিয়ে।

এই লোকটির সঙ্গে আমি কেন দেখা করতে এসেছি জানিনা। ঝোঁকের মাথায় চিঠি লিখেছিলাম। এখন, লোকটিকে একঝলক দেখেই মনে হল — আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। এখন চলে গেলেই হয়। কিন্তু কী বলে চলে যাব, হঠাৎ ? আমি চুপ করে বসে রইলাম নাম ও পরিচয় বিনিময়ের পর। চাকর এসে চা দিয়ে গেল, তবু অস্বস্তিকর নীরবতা। বিষম অনুতাপ হতে লাগল আমার, কোন হঠকারিতায় এসেছি এখানে। এ মানুষের মুখ থেকে আমার কিছুই জানার নেই। এই লোকটি কেন তাঁর চোখ দান করে যেতে চান — তা জেনে আমার কী দরকার ? আমি চোখ নিচু করে টেবিলে আঙুল দিয়ে অদৃশ্য ছবি আঁকতে-আঁকতে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম, লোকটিই আমাকে প্রশ্ন করবেন। একবার মুখ তুলে দেখি, ভদ্রলোক আমার দিকে তীব্র চোখে তাকিয়ে আছেন। চোখাচোখি হতেই আমার মাথায় একটি প্রশ্ন খেলা করে গেল। কোন্ চোখটা ? ডানদিকের না বাঁদিকের — কোন চোখটা তিনি দান করতে চান ? বেশ টানাটানা সুন্দর চোখ ভদ্রলোকের। যুগ্ম ভ্রূ।

— আপনি কি বেঁচে থাকতেই চোখটা দিয়ে যেতে চান? .

— হ্যাঁ।

— এত অল্পবয়সে? আপনার তো মৃত্যুর সময় হয়নি। এর মধ্যেই একটা চোখ হারাতে আপনার কষ্ট হবেনা?

— আমার লাং ক্যান্সার আছে। আমি দু-এক বছরের বেশি বাঁচবনা, জানি।

— আপনার পরিবারের কেউ আপত্তি করছেননা?

— আমার পরিবারে কেউ নেই।

খুব কাটাকাটা উত্তর ভদ্রলোকের। সবসময় একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে কথা বলছেন। যারা চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে — সেইসব লোক সাধারণত সত্যবাদী হয়, সেই সঙ্গে আত্মবিশ্বাসী। লোকটি তাঁর ব্যক্তিত্ব দিয়ে ক্রমশ আমার ওপর প্রভাব বিস্তার করছিলেন। সেটা কাটিয়ে ওঠার জন্য আমি ওঁর আত্মবিশ্বাসে আঘাত করতে চাইলাম। জিজ্ঞেস করলাম, মানুষের উপকার করার হঠাৎ এরকম ইচ্ছে হল কেন আপনার?

— মানুষেব উপকার?

— এই চোখ দিযে যাওয়া। সব লোকই তো দুটি চোখ সমেত মারা যায়।

— আমাব একটি ছেলে জন্মেছিল। জন্মান্ধ। সে মারা যাবার পব এই কথাটা আমার মাথায় আসে।

— দুটো চোখই তাহলে দিয়ে যাচ্ছেননা কেন?

— একটা রেখে দিচ্ছি, বাকি যে কটা দিন বাঁচব — সে কটা দিন কাজ চালাবাব জন্য। তাছাড়া, মৃত্যুর পর কী আছে জানিনা। যদি তখন কাজে লাগে, মৃত্যুব পর স্বর্গ বা নরকে যদি কিছু দেখার দরকার হয়, তাই একটা বেখে দেওযা ভালো।

— কোনটা?

ভদ্রলোক চুপ করে রইলেন। তারপর এই প্রথম মুখটা ফেরালেন। আমি খেলাচ্ছলে ওঁর মুখের সামনে হাতটা নিয়ে গিয়ে বললাম, কোন চোখটাকে আপনি বেশিদিন বাচিয়ে রাখতে চান?

তিনি কোন উত্তর দিলেননা। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম একটু নিষ্ঠুরের মতো, ডানদিকেরটা না বাঁদিকেরটা, কোন চোখটাকে আপনি বেশি ভালোবাসেন?

ভদ্রলোক বললেন, আপনি অলৌকিকে বিশ্বাস কবেন?

অবাক হয়ে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল, অলৌকিক?

— হ্যাঁ, আপনার তো বয়েস অল্প। কিন্তু তবু, কোনরকম অলৌকিকে বিশ্বাস করেন?

— অলৌকিক বলতে ঠিক কী বলতে চাইছেন ? যদি ঠাকুর-দেবতার ব্যাপার হয়, এখনও নির্ভয়ে বলতে পারি, না, করিনা। কিন্তু, রাত্রের দিকে খানিকটা ভূতটুতে বিশ্বাস করি এখনো।

এই প্রথম ভদ্রলোক মৃদুভাবে হাসলেন। বললেন, না, তা নয়। মাসখানেক আগে ঠিক করেছিলাম, বাঁ চোখটা দান করব। মনঃস্থির করে ফেললাম। তারপরের কয়েকটা দিন হঠাৎ বাঁ চোখটায় ব্যথা করতে লাগল। জল ঝরতে লাগল অনবরত। তখন ভাবলাম, এ চোখটা বোধহয় খারাপ হয়ে যাচ্ছে, অসুখ হয়েছে কোন। ডাক্তার দেখাবার আগেই ঠিক করলাম, ঐ খুঁতধরা চোখটা তাহলে আব দেবনা, ডান চোখটাই দেব। আমার বাকি কটা দিন ঐ খারাপ চোখটাতেই চলে যাবে। তাবপর ... ভদ্রলোক আমার দিকে আবার তীব্র চোখে তাকালেন। বুঝতে পাবলাম, তিনি সত্যি কথা বলেছেন।

তারপর, আমার বাঁ চোখটা হঠাৎ সেরে গেল। কিন্তু, এবার ডান চোখটা ব্যথা কবে জল ঝবতে লাগল। মনে হল, ঐ চোখটা একা-একা কাঁদছে সবসময়। রাত্তিরে শুয়ে মনে হত, ঐ চোখটা অনবরত কেদে-কেঁদে আমাকে কিছু বলতে চাইছে। যেন মিনতি করছে করুণভাবে। — আমাকে নয়, আমাকে নয়, আমি কী দোষ করেছি যে আমাকে আপনি বিদায় করে দেবেন। শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কি আলাদাভাবে প্রাণ আছে ? ওদেব আলাদা ইচ্ছে-অনিচ্ছে আছে ? নইলে, যখনই যে চোখটাকে দান করব ভাবি, তখনই সেটা থেকে জল পড়ে কেন ? একে আপনি অলৌকিক বলবেননা ? যাই হোক, তখন ঠিক করলাম, আগে থেকে আব ভাববনা। অপারেশনের ঠিক আগের মুহূর্তে বেছে নেব। এখন দুটো চোখই ভালো আছে।

— আপনার চোখদুটি ভারি সুন্দব।

— আমার দৃষ্টিশক্তিও খুব উজ্জ্বল। জানালা দিয়ে দেখুন, লেকেব দক্ষিণ পাড়ের ঐ দোকানটার সাইনবোর্ড এখান থেকে পড়তে পারেন ? আমি এই বয়েসেও পারি। ঐ যে দেখুন-না, কমলা স্টোর্স, নিচে ছোট হরফে লেখা সর্বপ্রকার স্টেশনারি ...

আমি মনে-মনে একটু হাসলাম। বুঝতে পারলাম, লোকটি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছেন। খসে যাচ্ছে গাম্ভীর্য। নইলে দৃষ্টিশক্তি নিয়ে এমন ছেলেমানুষী গর্ব করতেননা। সরকারি বনবিভাগের এই প্রাক্তন কর্মচারীটি, অরবিন্দ বায়চৌধুরী, একা বসে পেশেন্স খেলা যার একমাত্র ব্যসন, পনেরো বছর আগে স্ত্রীবিয়োগ হবার পর যিনি আর দারপরিগ্রহ করেননি — এতক্ষণ তাঁকে একটা কঠিন, অবাস্তব মানুষ বলে মনে হচ্ছিল — এবার আমি তাঁর শরীরের শিরা ও স্নায়ু দেখতে পেলাম।

এমনকি বুকের মধ্যে ক্যান্সারের ঘা পর্যন্ত। চোখ দান করা নিয়ে কোন অহংকার করছেননা, কিন্তু এত নিরাসক্ত হবার মতো অহংকার তিনি কোথায় পেলেন? বললাম, আপনি অপারেশন করে চোখ তুলে দেবার এক মাস পরেই যদি ক্যান্সারের ওষুধ বেরিয়ে যায়? তাহলে আপনি বাকি জীবন এক চোখে বাঁচবেন?

— আপনি বেশি আশাবাদী।

— যে কোন মুহূর্তেই তো বেরুতে পারে।

— তা হোক। একটা চোখই আমার যথেষ্ট।

— আপনি যাকে চোখ দেবেন, তাকে নিজে দেখে যেতে চান?

— হ্যাঁ। নিশ্চয়ই। না-হলে তো আমি 'আই ব্যাঙ্কে' দান করতে পারতুম। আমি একটি বাচ্চা ছেলেকে দিয়ে যেতে চাই।

— কেন?

— এমন একজন স্বাস্থ্যবান শিশুকে দিতে চাই — যে বহুদিন বাঁচবে। কারণ —

ভদ্রলোক একটু লাজুকভাবে হাসলেন। আমি এমনভাবে ওঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম — যার একমাত্র মানে হয়, বলুন-না!

— এ জীবনটা কেটে গেল, কিন্তু কী দেখলাম? রাস্তায় বেরুলে এখন কী দেখি? জানেন, যখন জঙ্গলে থাকতাম, আমি গুলি খেয়ে হরিণকে ছটফট করে মরতে দেখেছি, নেকড়ে বাঘের মুখে খরগোশের বাচ্চাকে মরতে দেখেছি — কিন্তু তার কিছুর সঙ্গেই তুলনা হয়না — এখন পথে বেরুলেই যে লক্ষ-লক্ষ না-মরা, অর্ধজীবন্ত মানুষ দেখি। কীরকম নিরাশ কালিমাময় মুখ! উঃ! মানুষের মুখ এরকম হয়? আগে মফঃস্বলে থাকতাম, পালিয়ে এসে শহরের চারতলায় আশ্রয় নিয়েছি। কিন্তু এ শহরেই বা কী দৃশ্য! এত অসংখ্য মানুষ, এদের মুখ দেখলে শিউরে উঠতে হয়। কোন আশা নেই, উৎসাহ নেই, দাবিও নেই। কোনরকমে বেঁচে আছে। এর নাম জীবন? আমি মরে যাচ্ছি, কিন্তু আমার চোখটা এমন একজনকে দিয়ে যাব — যে অনেকদিন বাঁচবে, ভবিষ্যতের সুন্দর পৃথিবী দেখে যাবে।

ভদ্রলোক যে শেষপর্যন্ত অতি সাধারণ মানুষের মতোই কথা বললেন তাতে নিশ্চিন্ত হলাম। একটা তাহলে স্পর্শসহ যুক্তি আছে। সেইটাই আমার জানার দরকার ছিল — কেন একটা লোক হঠাৎ চোখ দিতে চায়। নেহাৎ মানুষের উপকার করবার জন্যই নয় তাহলে! নিজের একটা শখ মেটাবার জন্য মৃত্যুর আগে সকলেই ভবিষ্যতের কথা ভাবে — ভবিষ্যতের সুন্দর পৃথিবীর কথা। একশো বা দুশো বছর আগে যারা মারা গেছে, তারাও ভেবেছিল। ভেবেছিল যে তাদের মৃত্যুর দু-দশ বছর পরই পৃথিবী সুন্দর হয়ে যাবে। শুধু তারাই দেখে যেতে

পারলনা। আমার ঠাকুরদা এ কথা ভেবেছিলেন, আমার বাবাও হয়তো ভেবেছেন মরার আগে। সকলেই ভেবেছেন, ইস, একটুর জন্য ভবিষ্যতের সুন্দর পৃথিবীটা দেখে যেতে পারলামনা ! এরকমই চলবে !

আমি এখন বাঁচব বেশকিছুদিন, এরকম আশা আছে, তাই ভবিষ্যতের সুন্দর পৃথিবী-টৃথিবীর কথা আমার একবার ভুলেও মনে পড়েনা।

ওঠার আগে আমি আরেকবার ভদ্রলোকের চোখের দিকে তাকালাম। হঠাৎ মনে হল, ওঁর চোখদুটির আলাদাভাবে, স্বাধীনভাবে অন্যকিছু বলার আছে হয়তো। হয়তো, আমার চোখদুটি ওদের স্বজাতির ভাষা বুঝেছে। কিন্তু আমি পারিনি।

২

আমি রাস্তার এপারে, রাস্তার ওপারে একজন অল্পচেনা লোককে দেখতে পেলাম। যথোপযুক্ত ভঙ্গিতে অল্প হেসে জিজ্ঞেস করি, ভালো আছেন ? তারপর আবার চলতে শুরু করেছিলাম, লোকটি ওপার থেকে কী যেন চেঁচিয়ে উঠলেন। ঠিক লক্ষ করিনি, ভদ্রলোক আবার বেশ চেঁচিয়ে বললেন, না, ভালো নেই।

দাঁড়াতেই হল। লোকটি রাস্তা পেরিয়ে কাছে এসে হাসি-হাসি মুখে বললেন, না, ভালো নেই ! বুঝতে পারলেন, আমি ভালো নেই ?

এবার আমি কী বলব, বুঝতে না-পেরে চুপ করে ছিলাম। তাছাড়া যাঁরা ভালো থাকেননা, তাঁরা নিজেরাই নিজেদের ভালো না-থাকার কথা শতমুখে বলবেন জানি। লোকটি কিন্তু একটু সামান্য হেসে বললেন, বিশেষ কিছুনা, 'ভালো আছি' শুনলেই তো চলে যেতেন, তাই 'ভালো নেই' বললাম। তবু একটু দাঁড়ালেন।

এবার আমিই হাসলাম। কিন্তু মুশকিল এই, লোকটির নাম আমার মনে পড়ছেনা, কোথায় আলাপ কিছুই মনে পড়ছেনা, মুখখানা সামান্য চেনা-চেনা। এরকম চেনা লোক পথেঘাটে অসংখ্য থাকে। পরিচয়ের গাঢ়তা অনুযায়ী সম্ভাষণ হয়। যেমন প্রাথমিক স্তরে ভ্রূ-নৃত্য। এই স্তরের লোকদের সাধারণত দূর থেকে দেখতে পেলে অন্যমনস্ক হবার ভঙ্গি করতে হয়, অত্যন্ত উদাসীনের মতো পথের পোস্টার পড়তে-পড়তে দুজনে দুজনকে অতিক্রম করে যাই। দৈবাৎ চোখাচোখি হয়ে গেলে ভুরুদুটো একবার নাচানো। এরপরের স্তরের সঙ্গে দেখা হলে ভ্রূদ্বয়ের ছুটি। সেখানে চোখ ও মুখে মোনালিসা ধরনের সুপ্ত হাসি এঁকে একবার তাকানো, বড়োজোর অস্ফুটভাবে বলা, ভালো ! — এর উত্তর শোনার জন্য থামতে হয়না, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উত্তর আসেনা।

তৃতীয় স্তরের সম্ভাষণই সবচেয়ে বিপদজনক। সেখানে এক মিনিট দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করতে হয়, কী খবর? — এই চলে যাচ্ছে আর কী! সত্যি, যা গরম পড়েছে! ও তাই নাকি! আচ্ছা, চলি! — এসব লোকের সঙ্গে দেখা হলে প্রায়ই মনে পড়েনা, লোকটির সঙ্গে আগে 'তুমি' কিংবা 'আপনি' কোনটা বলতাম। তখন ভাববাচ্যের আশ্রয় নিতে হয়। — কী করা হয় আজকাল? কোথায় যাওয়া হচ্ছে? কলকাতার বাইরে থাকা হয় বুঝি? কথা বলার সময়েই মনে-মনে হিসেব করতে হয়, যথেষ্ট ভদ্রতাসূচক সময় ব্যয় করা হয়েছে কিনা এর সঙ্গে!

এরপর যাঁরা, তাঁদের সঙ্গে কোন-না-কোন সূত্রে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা থাকার কথা, অথচ মনে-মনে নেই, মুখেও বিশেষ কিছু বলার নেই। আত্মীয় বা বন্ধুর বন্ধু বা প্রেমিকার অন্য প্রেমিক। এঁদের সঙ্গে দেখা হলে যথেষ্ট উল্লাসের ভঙ্গিতে বলতে হয়, আরে কী খবর! দেখাই নেই যে! চেহারাটা খারাপ হয়ে গেছে দেখছি! — তারপর, অমুক কেমন আছে? ওখানে আর গিয়েছিলেন? — এইসব কথা বলার সময় এমন ভাব করতে হয় যেন ওঁকে দেখে আমি সমস্ত বিশ্বসংসার বিস্মৃত হয়েছি। তারপর সূক্ষ্মকোণী চোখে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে অকস্মাৎ সমস্ত শরীর ঝাঁকিয়ে বলে উঠি, আরেঃ তিনটে বেজে গেছে! ইস, একটা বিশেষ কাজ আছে, ভুলেই গিয়েছিলাম। চলি। আবার দেখা হবে। অ্যাঁ? — এরপর অত্যন্ত দ্রুতভাবে কিছু দূর গিয়ে চলন্ত ট্রামে উঠে পড়তে পারলে সবচেয়ে ভালো হয়।

টাকা ধার করিনি, চুরি করিনি, ঝগড়া করিনি, কোনরূপ অন্যায় করিনি, তবু অনেক লোককে দূর থেকে দেখেই রাস্তার ছায়ার ফুটপাথ ছেড়ে রোদ্দুরের ফুটপাথে চলে যেতে হয়। এই এড়িয়ে যাবার কারণ আরকিছুই-না, অকারণে বাক্যব্যয় বা ভুরু নাচানোর অনিচ্ছা। একেক সময় হয়তো আমার মেজাজ খারাপ বা মন বিষণ্ণ, তবু হঠাৎ কারুকে দেখে জোর করে মুখে হাসি ফোটাতে গা রি-রি করে।

অবশ্য এর উল্টোটাও আছে। কোন গণ্যমান্য ব্যক্তি বা উচ্চপদস্থ লোক আমাকে দেখেই চোখ ফিরিয়ে পথের শোভা নিরীক্ষণ করছেন বা সোজাসুজি চোখের দিকে তাকিয়েও না-চেনার ভান করছেন, তখন নিজেকেই এগিয়ে যেতে হয়, নমস্কার ঠুকে বিগলিত হাস্যে বলতে হয়, আমাকে চিনতে পারছেন? তাঁর সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে হয় অতি আন্তরিকভাবে, শব্দ নির্বাচন করতে হয় অতি সাবধানে, যাতে প্রতিটি বাক্যই হয় প্রচ্ছন্ন স্তুতি। আর, অন্তরীক্ষসঙ্গীতের মতো সর্বক্ষণ তো বিগলিত হাস্য আছেই। পুরো দৃশ্যটির এককথায় সারমর্ম এই: সময়কালে যেন আপনার কৃপার ছিটেফোঁটা পাই!

সবচেয়ে অস্বস্তিকর লাগে যদি পনেরো-কুড়ি বছর পর হঠাৎ কারুর সঙ্গে

দেখা হয়ে যায়। হয়তো স্কুলে ক্লাস সিক্স-সেভেনে সে ছিল আমার প্রাণের সুহৃদ, সে আমাকে টিফিনের সময় অসুখের ভান করে ছুটি নেওয়া শিখিয়েছিল, সে আমার জন্য সিনেমায় ছ-আনার লাইনে জায়গা রাখত। তার সঙ্গে বদলাবদলি করে যত রাজ্যের রগরগে গোয়েন্দা গল্প, পরে অশ্লীল বই পড়তে শুরু করি, আমার ঘুড়ির সুতোয় মাঞ্জা দেবার সময় সে টিপ্‌নি ধরত। তারপর পনেরো বছর কেটে গেছে, কেউ কারুর খবর রাখিনা, পরস্পরের জীবন এখন কোথায় বেঁকে গেছে কেউ কিছু জানিনা। গলার আওয়াজ বদলে গেছে, চেহারা বদলে গেছে। দেখা হলে কথা বলার কিছুই থাকেনা। দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে মনে পড়ে সেই ইজের ও গেঞ্জি-পরা খালিপায়ের বাল্যকাল, পরস্পরের সেই চেহারা আমরা দেখি নিঃশব্দে। যদিও আজ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি দুজন ভদ্র সভ্য, পুরো-প্রস্থ পোশাকপরা পুরুষ, কী কথা বলব জানিনা, দেখা হলেই তো আর বাল্যের কথা শুরু করা যায়না; সেই ঘুড়ির মাঞ্জা কিংবা শেষপাতা-ছেঁড়া গোয়েন্দা গল্পের কথা। আমরা চুপ করে থাকি, দু-একটা মামুলি কথা বলে বিদায় নিই। অমন একদা-প্রাণের-বন্ধুর সঙ্গে গলা জড়িয়ে একটাও কথা বলা হলনা দেখে ভিতরটা হাহাকার করে।

অবশ্য বহুদিন-পর-দেখা সব ছেলেবেলার বন্ধুই অমন বাল্যে ফিরে যায়না। অনেকে ঘোরতর সংসারী হয়ে গেছে, ওসব কিছুই মনে নেই হয়তো, পান চিবুতে-চিবুতে যাচ্ছেতাই সব প্রশ্ন করে। বিশেষ করে একটি প্রশ্নের জন্য আমি সবসময় শঙ্কিত থাকি। শুনলেই রাগ হয়, বিশেষত সে প্রশ্নের উত্তর জানিনা বলেই বহুদিন পর ক্ষণিকের জন্য দেখা, আবার বহুদিন দেখা হবেনা, তবু ঐটুকু সময়ের মধ্যেই আমাকে অত্যাচার না-করলে যেন ওদের আশা মেটেনা। যেমন, এ কথা সে কথার পর ওরা জিজ্ঞেস করবেই, এখন কী করছিস?

উত্তরে আমি বলি, এখন? এখন একটু মানিকতলায় যাব।

— না, না, কোথায় আছিস?

— দমদম।

এতেও ওরা একটুও দমিত হয়না। তাকায়না আমার নিষেধ-আঁকা চোখে। এরপরেও জিজ্ঞেস করে, কোথায় গেলে তোর সঙ্গে দেখা হবে? আমি বলি, একদিন দমদম আমার বাড়িতে আয়-না।

কিন্তু এসব শুনে তৃপ্তি হয়না ওদের। ওদের যেন জীবনমরণ নির্ভর করে একটা বিশেষ কথা জানার ওপর। এরপর বলে, কী কাজ করছিস?

তখনও এড়িয়ে যাবার প্রাণপণ চেষ্টায় আমি উদাস ভঙ্গিতে বলি, জীবনের সত্যিকারের কাজ এখনও কিছুই শুরু করিনি ভাই! কিন্তু ঐ নিরেটের দল তখন

প্রায় ক্ষেপে উঠে জিজ্ঞেস করে, কোথায় চাকরি করছিস বল-না!

'বেকার' শব্দটা আমি মোটেই পছন্দ করিনা। কোথা থেকে ঐ অবাঙালি শব্দটা বাংলাভাষায় জুড়ে বসল কে জানে। অথচ এর আর কোন প্রতিশব্দও নেই। 'চাকরি করিনা', বলব? উঁহু, এতেও কাজ হয়না, বলে দেখেছি। তাতেও ঐ থান-ইঁট-দিয়ে-তৈরি-করা মাথারা জিজ্ঞেস করে, অ, বিজনেস করছিস বুঝি?

এরপর অত্যন্ত রূঢ়ভাবে সঙ্গে-সঙ্গে বিদায় নিয়ে চলে যাই।

মেয়েদের সঙ্গে দেখা হলে এসব ঝঞ্ঝাট নেই। অধিকাংশ মেয়েই পথে দেখা হলে চিনতে পারেনা। মেয়েদের একটা বিচিত্র সীমাজ্ঞান আছে। যে মেয়ের সঙ্গে তার বাড়িতে আলাপ, অথবা কোন-না-কোন ফাংশনে, সে শুধু তার বাড়িতে বা ঐধরনের কোন ফাংশনেই চিনতে পারবে, অন্য কোথাও নয়। এছাড়া, বিয়ের আগে যার সঙ্গে পরিচয়, বিয়ে হয়ে যাবার পর তাকে তো আর চিনতে পারার রীতিই নেই। আরেকধরনের মেয়ে আছে যারা মুখোমুখি পথে দেখা হলে চোখ নামিয়ে নেবে সঙ্গে-সঙ্গে, তারপর একটু পরে আরেকবার তাকাবে স্থিরভাবে কয়েক সেকেন্ড, তারপর আবার চোখ নামিয়ে হাঁটতে শুরু করবে। ভাবখানা এই, আমি যদি আগে কথা বলি, তাহলেই তিনি দয়া করে আমাকে চিনতে পারবেন। এসব ক্ষেত্রে আমি কথা বলিনা। না, আগে লক্ষ করি, মেয়েটির মুখে চেনা-হাসি আছে কিনা।

আরেকদল মেয়ে পথে সামনাসামনি দেখা হলে একদম চিনতে পারেনা, কিন্তু চলন্ত গাড়ি, বাস বা ট্যাক্সি থেকে দেখলে চেনামুখে হাসে, অনেকসময় হাত নাড়ায়। কিন্তু কখনো থামেনা। তারা দ্রুত চলে যাবে বলেই এক মুহূর্ত চেনার ভান করে। জীবনে একবারমাত্র একটি মেয়ে আমার সামনে জিপ গাড়ি থামিয়ে বলেছিল, একী আপনি এখানে? আসুন আমার সঙ্গে।

যে মেয়েরা দেখা হলেই হাসিমুখে চিনতে পারে, তাদের সঙ্গে কথা খোঁজার কোন সমস্যাই নেই। তাদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাসস্টপে দাঁড়িয়ে কথা বলা যায়, অথবা চায়ের দোকানে, অথবা বাড়ি পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত। দুজন পুরুষবন্ধুতে দেখা হলে আড্ডা হয়না, খোঁজ পড়ে তৃতীয়ের বা চতুর্থের; কিন্তু একটি মেয়ের সঙ্গে একটি ছেলে কথা বলতে পারে দীর্ঘক্ষণ, প্রেম না-করেও, কী কথা কে জানে।

এই সমস্ত অলিখিত নিয়ম আছে সম্ভাষণের; এই কলকাতা শহরে। প্রত্যেকটি চেনা লোক বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা। এদের জন্যে কোন লিস্ট বানাতে হয়না, দেখা হলেই মনে-মনে তৎক্ষণাৎ ঠিক হয়ে যায় — শুধু ভ্রূ-নৃত্য, না হাসি, না এক মিনিট, না চায়ের দোকান পর্যন্ত। প্রতিদিন একরকম, কোন নড়চড় নেই। যার

সঙ্গে শুধু 'কী খবর' বলেই চলে যেতে হয়, কোনদিন তার সত্যিকারের খবর শোনার আগ্রহ হয়না।

আজ আমার শুকনো 'ভালো আছেন?' — প্রশ্নের উত্তরে লোকটির রাস্তা পেরিয়ে আসা এবং এসে বলা,'না ভালো নেই', শুনে আমার অবাক না-হলে চলেনা। কী আশ্চর্য, লোকটি কি সভ্যসমাজের লোক নয়? জানেনা যে, লোকটি সত্যিই ভালো আছে কিনা সে সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই, খারাপ থাকা বিষয়ে তো নয়ই।

আমি ঠোঁটে হাসি এঁকে অত্যন্ত অপ্রসন্ন মনে দাঁড়িয়ে থাকি। লোকটি বলে, জানেন, রমলা আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। না, না, আসলে, আমিই রমলাকে ছেড়ে চলে এসেছি! ভালো থাকব কী করে বলুন।

লোকটির নাম আমার কিছুতেই মনে পড়েনা। তাছাড়া, রমলা বিষয়ে তো আমি কিছুই জানিনা। কে রমলা? কোথাকার রমলা? কে তাকে ছাড়ল, কেনই-বা...। না, রমলা নামের কাউকে আমি চিনিনা। এই লোকটাকেই-বা কীভাবে চিনি? মনের প্রতিটি কোণে আমি তখন ওয়ারেন্ট নিয়ে জোর তল্লাস চালাচ্ছি — হঠাৎ মনে পড়ল, লোকটি একটি ওষুধ কোম্পানির সেলসম্যান, বছরতিনেক আগে চিনতাম — কথার মধ্যে-মধ্যে চশমার ব্রিজটা হাত দিয়ে টিপে ধরার অভ্যেস দেখে লোকটির পরিচয় আমার মনে পড়ল, লোকটির ব্যক্তিগত জীবন তো আমার জানার কথা নয়।

লোকটি আমার কাছাকাছি সরে এসে বলল, খুব খারাপ আছি, বুঝলেন! আপনি পুলিশে চাকরি করেননা তো?

আমি বিস্মিতভাবে 'না' বলি।

— যাক! আমাকে পুলিশে খুঁজছে। সবসময় স্পাই ঘুরছে আমার পেছনে। জীবনটা অতিষ্ঠ করে দিলে।

— কেন? হঠাৎ —

— আর বলবেন-না! ওদের ধারণা, আমি রমলাকে পাচার করে দিয়েছি। হেঃ! আমি রমলার কে মশাই? আমি তো তাকে ছেড়ে চলে এসেছি। দেখুন-না, মটরগাড়িও চড়িনা আজকাল। মাছ-মাংস খাইনা। রাত্তিরে আসে যদিও। রোজ রাত্তিরে বিরক্ত করতে আসে। গায়ে সেই কালোরঙের কটকী শাড়ি, পায়ে আবার বাঈজীদের মতো নূপুর, সারারাত ধরে ঝমঝম ঝমঝম, ঝমঝম ঝমঝম ঝম —

যাক। লোকটা পাগল হয়ে গেছে! আমি ভেবেছিলাম, কী না কী। সভ্যসমাজ বুঝি বদলে গেল। 'ভালো আছেন?'-এর উত্তরে 'ভালো নেই' বলা শুরু হল

বুঝি। তা নয়, সভ্যসমাজ ঠিকই আছে, ভ্রূ-নৃত্য আর স-দাঁত হাসি। এ লোকটাই শুধু আলাদা, নেহাৎ একটা পাগল।

৩

বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলাম, এমনসময় শুনতে পেলাম দূরের একটা বাড়িতে যেন একসঙ্গে অসংখ্য কাঁসার বাসন ভাঙা হচ্ছে — সেই ঝনঝন শব্দ। একটু মনোযোগ দিতেই বুঝতে পারা গেল, কাঁসার বাসন নয়, অনেকগুলি স্ত্রী-কণ্ঠের চিৎকার। ক্রমাগত, একটানা সেই স্বর কিছুক্ষণ চলল। কান্নার না আনন্দের, দূর থেকে মেয়েদের কণ্ঠ শুনে আমি কোনদিন বুঝতে পারিনা।

কিন্তু ধ্বনি বেশ প্রবল, আশেপাশের বাড়ি থেকে একসঙ্গে বহুলোক ছুটে গেল সেদিকে। বেলা আন্দাজ এগারোটা, সুতরাং ভিড় তেমন উপযুক্ত হলনা — অধিকাংশই বৃদ্ধ ও অপর মেয়েরা, বাচ্চার দল, কয়েকটি বেকার ছোঁড়া। প্রথমে গণ্ডগোল কিছুই বোঝা গেলনা, আমার বারান্দা থেকে স্পষ্ট দেখা যায়, কিন্তু ঠিক শ্রবণ-দূরত্বে নয়। আমি খুব কৌতূহলী ছিলামনা। কিছুটা অলস চোখেই তাকিয়ে ছিলাম, এ সমস্ত লোকাল কোলাহল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খুব লঘু কারণে হয়।

একটু পরেই একটা কালো পাৎলুন-পরা ছোকরা এগিয়ে এসে, তার তিনতলা বাড়ির রান্নাঘরে কড়াই চাপানো উনুনেব কাছ থেকে সরে-আসতে-না-পারা উদগ্র ব্যগ্রতাময়ী বউদির উদ্দেশে চেঁচিয়ে জানাল যে, ও বাড়ির একতলার ভাড়াটে বউটি আত্মহত্যা করেছে। খবরটা আমিও ওর মুখ থেকেই জানতে পারলাম, এবং জেনে চমকে উঠতেই হল।

আত্মহত্যা ? বেলা এগারোটায় ? ব্যাপারটার মধ্যে বিশেষত্ব আছে সন্দেহ নেই। প্রথমটায় আমি বিশ্বাস করিনি। আত্মহত্যা তো রাত্তিরের কারবার, চিরকাল সেইরকমই হয়ে আসছে। কিন্তু এই কাঁচা দুপুরে ? সুতরাং আমার মনে হল, হয়তো উনুন থেকে হঠাৎ কাপড়ে আগুন লেগে ভদ্রমহিলা অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

কিন্তু, না। জনতার উচ্চগ্রাম থেকে জানা গেল ভদ্রমহিলা বিষ খেয়েছেন, পাশেই 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয় !'

কয়েকজন সশব্দে ছুটে গেল থানা ও অ্যাম্বুলেন্সে ফোন করতে।

আমি বারান্দায় দাঁড়িয়েই তৎক্ষণাৎ ভেবে দেখলাম, ভদ্রমহিলাকে আমি কখনও দেখেছি কিনা। হয়তো না, দেখলেও ওঁর মুখ আমার মনে নেই, কিংবা

ঠিক কোন ভাড়াটে বউটি, তা আমি জানতে পারিনি। আমি তখনও বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে ছিলাম।

মাসছয়েক আগের ঘটনা। আমি তৎক্ষণাৎ যে বারান্দা থেকে নেমে ছুটে যাইনি জনতার মধ্যে, তার কারণ ছিল খুবই সামান্য। আমার চটিজোড়া একেবারে ছেঁড়া ছিল — আমি পা-জামা পরে দাঁড়িয়ে ছিলাম খালি পায়ে। একজোড়া শু সম্বল। পাজামার সঙ্গে তো আর শু পরে রাস্তায় বেরুতে পারিনা। অথবা, একজন ভদ্রমহিলা মারা গেছেন শুনে — সেই মুহূর্তে আমি পোশাক বদলে প্যান্ট-শার্ট পরে সেজেগুজে তবে পথে বেরুব, এটা কেমন দৃষ্টিকটু লাগল। অথবা খালিপায়েই দ্রুত ছুটে — কিন্তু কলকাতা শহরে খালি পায়ে? অসম্ভব, জামাকাপড় পরে খালিপায়ে — ঐ ভদ্রমহিলার জন্য আমার অশৌচ শুরু করার কোন কারণই নেই। আমি বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে ছিলাম।

হয়তো, ছুটে না-যাবার আরেকটু গুপ্ত কারণ আমার ছিল। আমি কোন মরা-মেয়ের মুখ দেখতে চাইনা। একবার দৈবাৎ দেখে ফেলেছিলাম, একটি অচেনা যুবতীর মরা-মুখ, একঝলক, কিন্তু সেই থেকে সে মুখ আমার মনে গেঁথে আছে, কিছুতেই তাড়াতে পারিনা। আমি আমার বান্ধবীদের মুখ অনেকসময় ভুলে যাই, কিন্তু কখনও ভুলতে পারিনি সেই মৃত মেয়েটির মুখ। আমি আরেকটি ওরকম মুখ বাড়াতে চাইনা। আমার বুকের মধ্যে কয়েকটি মরা মেয়ের মুখের প্রদর্শনী থাক, আমি চাইনা।

তাছাড়া, অলস ভঙ্গিতে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম, সেই ভঙ্গি বদলে ব্যস্ত হবার আমার কীই-বা প্রয়োজন। রেডিওতে বিবিধ ভারতীর কু-সঙ্গীত হচ্ছে, ওরা তো এই মৃত মহিলার সম্মানে গান বন্ধ করেনি, এমনকি অনেক বাড়িতে রেডিও পর্যন্ত বন্ধ হয়নি — দূরে ট্রাম ও বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি — কেউ থামেনি, একটি মহিলার মৃত্যুতে কোথাও কিছু বদল হয়নি — সবই একরকম চলছে, শুধু এই গলিটুকুতে ছাড়া।

ততক্ষণ এই গলিপথ ভর্তি হয়ে গেছে মানুষে, কী করে এত মানুষ এত দ্রুত খবর পায় জানিনা। মানুষ মরার গন্ধে শকুন আসেনা, মানুষই আসে। আমি সেই জনতাকেই লক্ষ করছিলাম।

সেইদিনই আমি আবিষ্কার করেছিলাম, জনপ্রিয় লেখকদের জনপ্রিয়তার রহস্য। তাঁরা জীবন বা মৃত্যুর সমগ্রতার সম্পর্কে কিছু লেখেননা, একটি লাইনও না, কারণ, কেউ তা শুনতে চায়না। ওঁরা শুধু লেখেন জীবন ও মৃত্যুর গল্প। মাত্র গল্পটুকু। দুঃখ, বেদনা, মমতা — বিশেষ করে মমতা এড়িয়ে যেতে হয় অতি সন্তর্পণে, মমতা শব্দের অর্থ 'আমারও যদি এরকম হয়' এই বোধের বেদনা। কেউ

তা চায়না, নিজের কথা মিলিয়ে নিতে চায়না। আমি সেদিন দেখলাম, ভিড়ের মধ্যে প্রতিটি মানুষের মুখে, চোখে, ভুরুতে, চশমার কাচে, আঙুলের ডগায়, ছাতার বাঁটে, জামার হাতায় — একটিমাত্র প্রশ্ন লেখা আছে — কেন, কেন, কেন, কেন? অর্থাৎ গল্পটা কী? গল্পটা? গল্পটা? জীবন ও মৃত্যু ঐ ভদ্রমহিলার জীবনে কতখানি খেলা খেলেছে কেউ জানতে চায়না, সবাই জানতে এসেছে শুধু সেই ক্রূর ঘটনাটুকুমাত্র — কেন মরল? কেন?

নির্লজ্জের মতো সরবে অনেকে অনেকরকম থিয়োরি দিচ্ছিল, অর্থাৎ প্রত্যেকের এক-একটি আলাদা গল্প — ব্যর্থ-প্রেম, মানসিক অসুখ, স্বামীর অবহেলা, ক্যান্সার, স্বামীই মেরে রেখে আত্মহত্যার মতো সাজিয়ে রেখে গেছে — এইসব। প্রত্যেকটা গল্পই কাঁচা, সবাই যেন অপেক্ষা করছিল একজন পাকা ঔপন্যাসিকের — যে এসে সবকিছু নিখুঁতভাবে জুড়ে দেবে। কেউ-কেউ বলছে, এই সরু গলিতে অ্যাম্বুলেন্স ঢুকবে? — অর্থাৎ, তখন গল্পের নায়িকার চেহারাটা ভালো করে দেখা যাবে তো? পুলিস আসতে এত দেরি করছে কেন? — অর্থাৎ পুলিশ এসে যদি সেই মুহূর্তেই গল্পটা আবিষ্কার করে ফেলে!

ফ্ল্যাশব্যাকে ভদ্রমহিলার পূর্বপরিচয়ও আমি বারান্দায় দাঁড়িয়েই শুনতে পেলাম। সুন্দরী। চার বছর বিয়ে হয়েছে — কিন্তু এ পাড়ায় ভাড়াটে হয়েছেন দেড় বছর। স্বামী কাস্টমসে কাজ করেন। ভদ্রমহিলা বি. এ. পাশ, কিন্তু কী আশ্চর্য, ভালো সেলাইও জানেন। কুমারী মেয়েরা ওঁর কাছে প্রায়ই দুপুরবেলা ডিজাইন তোলা শিখতে যেত। সাবুর পায়েস রান্না উনিই এ পাড়ায় প্রবর্তন করেছেন। ওঁর স্বামী একবার পাড়ার স্পোর্টসের পুরস্কার-বিতরণীতে সভাপতি হয়েছিলেন মূল সভাপতির অনুপস্থিতিতে। প্রেম করে বিয়ে কিনা, তাই এখনও ছেলেমেয়ে হয়নি। স্বামী-স্ত্রীতে একসঙ্গে প্রায়ই সন্ধেবেলা সিনেমা দেখতে যেতেন। আত্মীয়স্বজন তো বেশি দেখা যায়নি, প্রায়ই আসতেন ভদ্রমহিলার মা, স্বামীর অফিসের বন্ধুরা! আর আসত মাঝে-মাঝেই একজোড়া স্বামী-স্ত্রী, ওরা ভদ্রমহিলার বান্ধবী ও তার স্বামী, অথবা ভদ্রলোকের বন্ধু ও তার স্ত্রী — এ কথা জনতা ঠিক জানেনা। ঘটনার দিন স্বামী ঠিক নটার সময় চলে গেছেন অফিসে, পানের দোকানের সামনে জটলা-করা ছেলের দল ওঁকে সিগারেট কিনে ট্রামে উঠতে দেখেছে, ভদ্রমহিলাকেও নাকি তারপর ছাদে কাপড় শুকোতে দিতে দেখা গেছে।

এ তো সরল সাদামাটা সংসার। তবে, এই সকাল এগারোটায় আত্মহত্যা? যদি নেহাৎ আত্মহত্যা করার দরকারই হয় তো রাত্রে করলেই তো হত। চুপি-চুপি। এইরকম দিনদুপুরে নাটকীয়ভাবে কেন? এরকম উত্তেজক ঘটনার পুরো গল্পটা জানার জন্য জনতা প্রায় হিংস্র হয়ে উঠেছে। কোথাও কোন ফিসফাস,

আহা-উহু বা ইস নেই। নানান জটলায় এক ধ্বনি উঠছে, কেন, কেন, কেন, কেন, কেন, কেন ? গল্পটা ? গল্পটা ? গল্পটা ? স্বামীর অফিসে টেলিফোন করা হয়ে গেছে। তাঁর আসতে দেরি হচ্ছে বলেও লোকে অসহিষ্ণু। স্পষ্ট বোঝা যায়, লোকটিকে সমবেদনা জানাবার জন্য নয়, সকলেই দেখতে চায় তাঁকে স্বচক্ষে, স্বামীটি এ গল্পের নায়ক না খলনায়ক ! স্বামী এসে কান্নায় ভেঙে পড়বে, না গুম হয়ে থাকবে ? তার মুখ দেখে বোঝা যাবে কি — এ ঘটনা সে আগেই জানত, নাকি হঠাৎ জেনে আকাশ থেকে পড়ল ! এমনসময় অ্যাম্বুলেন্স আসতেই আমি বারান্দা থেকে সরে গেলাম। আমি ভদ্রমহিলার মুখ দেখতে চাইনা।

ভদ্রমহিলার আত্মহত্যার গল্পটা আমি জানিনা। শেষ পর্যন্ত জানা হয়নি। আমি গোয়েন্দা বা গল্পলেখক নেই। অন্যান্য সমস্ত জন্তু-জানোয়ারের থেকে মানুষ মাত্র দুটো ব্যাপারে আলাদা। মানুষই একমাত্র চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতে পারে — বাঘ, ভাল্লুক এমনকি বাঁদরও তা বেশিক্ষণ পারেনা, মরার আগে। মানুষই একমাত্র মরার আগেও যতক্ষণ খুশি আকাশের দিকে মুখ করে শুয়ে থাকতে পারে। মরার আগে মড়ার ভঙ্গি মানুষকেই মানায়। আর, মানুষই একমাত্র আত্মহত্যা করতে সক্ষম, মৃত্যুর আগে নিজেই নিজের জীবনকে শেষ করার ইচ্ছে একমাত্র মানুষেরই হয়। এ ব্যাপারে সে ঈশ্বরের চেয়েও বড়। ঈশ্বর অজর, অমর — তাই তাঁর আত্মহত্যা করার ক্ষমতা নেই। মানুষের আছে। আত্মহত্যার ইচ্ছে যে কোন মানুষের একান্ত, অতি ব্যক্তিগত, আমি কারণ জানতে চাইনা।

তবে, একটা কথা কানে এসেছিল। ভদ্রমহিলা শেষ পর্যন্ত মারা যাননি। হাসপাতালে স্টমাক পাম্প করে বিষ বার করে ফেলা হয়, কয়েকদিন ভুগে ভদ্রমহিলা আবার ফিরে এসেছিলেন। কেন আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন, তা যেমন আমার জানা হয়নি, অকস্মাৎ বেঁচে উঠে তিনি লজ্জিত বা অনুতপ্ত, আরও বেশি কাতর না বেশি আনন্দিত হয়েছেন, তাও জানিনা।

ছ-মাস আগে এই ঘটনা ঘটেছিল। আজ সকালে আবার সেই বাড়ি থেকে কান্নার রোল উঠল। তবে সেবারের মতো অত জোরে নয়। একটা ট্যাক্সি থেকে ভদ্রমহিলা, তাঁর মা ও স্বামীর সঙ্গে নামলেন এইমাত্র। বাড়িতে ঢুকেই দুজন নারীর কণ্ঠের কান্না। পাড়ায় দু-একটি বাড়ির জানলা খুলে গেল, দেখা গেল কয়েকটি উৎসুক মুখ। কিন্তু বাড়ির সামনে একটুও ভিড় হলনা, একজন লোকও এসে দাঁড়ালনা। পাড়ার লোক রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, আজ ছুটির দিনের সকালে অনেক লোক, কিন্তু কেউ ভুলেও বাড়ির সামনে দাঁড়াচ্ছেনা।

কারণ, এবারের গল্প সবারই জানা। কয়েকদিন আগে নার্সিং হোমে ভদ্রমহিলা

একটি মৃতসন্তান প্রসব করেছেন। দু-একদিন আগে সে খবর ছড়িয়ে গেছে এ পাড়ায়। তাই আজ সকালে আর কারুর কোন কৌতূহল নেই।

৪

হার্মাদ! হার্মাদ! দূর সমুদ্রে হয়তো দেখা গেছে কয়েকটি জাহাজের পাল, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কারুর চোখে পড়েছে কঙ্কালচিহ্ন আঁকা পতাকা, অমনি বাঙলা দেশের উপকূলবর্তী গ্রামে-গ্রামে রব ওঠে, হার্মাদ! হার্মাদ! পর্তুগীজ জলদস্যু আসছে বাঙলা দেশের গ্রাম জ্বালিয়ে দিতে! লুঠতরাজ করতে, ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী নিয়ে যেতে। চোখের নিমেষে গ্রামের নারী-পুরুষ-শিশুরা হাতের সামনে যা-কিছু সম্বল টপাটপ তুলে নিয়েই ছুট, উধাও। সহস্র কণ্ঠে ভয়ের চিৎকার, হার্মাদ! হার্মাদ!

অথবা,

নর্দমায় ভন্‌ভন করছে অযুত সংখ্যক মশা। কালো জলের ওপর সরের মতো ভাসছে মশাদের শিশুসমাজ। বেশ শান্তিপূর্ণ পরিবেশ, হঠাৎ কোন দুরন্ত বালকের হাত নর্দমায় একটা ঢিল ছুঁড়ল। অমনি পিনপিন শব্দে ছত্রভঙ্গ হয়ে উড়ে উঠল কয়েক নিযুত মশা। পিনপিন শব্দে ওরা কী বলে তা অবশ্য এখনও জানিনা।

অথবা,

আরেকটা দৃশ্য মনে পড়ল। চাইবাসার অসমতল মাঠে দেখেছিলাম একটা মরা কুক্কুরীর শরীর ছিঁড়ে খাচ্ছে বিশ-পঞ্চাশটা শকুন। অতগুলি বৃহৎ ও বিকট পক্ষী-জানোয়ারকে মাটির ওপর কাছাকাছি আগে দেখিনি কখনও। একটা টিলার আড়ালে দাঁড়িয়ে আমরা কয়েকজন দেখছিলাম, শকুন মানুষের চোখ ঠুকরে খায় — এরকম একটা ভয়ও ছিল। এমনসময় দেখলাম, আরেকটা অমিততেজা কুকুর। কুকুরটা খুব বড় নয়। ভয়ংকরও না, কিন্তু ওর ঐ দুঃসাহসী ভঙ্গিতে তীব্র গতিতে ছুটে আসা দেখে মনে হচ্ছিল কোন দীপ্ত অশ্বারোহী ছুটে আসছে পাহাড় থেকে, নারীকে উদ্ধার করার জন্য কোন মধ্যযুগের নাইট। প্রত্যেকটা শকুনের চেহারাই কুকুরটার চেয়ে বড়, কিন্তু তবু ওকে অমনভাবে ছুটে আসতে দেখে একসঙ্গে অতগুলো শকুন ক-র-র-র, ক-র-র-র শব্দ করতে-করতে উড়ে গেল। ঢালু জায়গা থেকে নেমে আসার জন্যেই বোধহয় কুকুরটার ছোটায় একটা মোমেন্টাম এসে গিয়েছিল, সহজে থামতে পারলনা, থামল বহু দূরে গিয়ে। ততক্ষণে

শকুনগুলো আবার নেমে আসছে। দূরে দাঁড়িয়ে কুকুরটা একটা চাপা গর্জন করে পিছনের দু-পা দিয়ে মাটি আঁচড়াল, তারপর সেইরকম ভীমবেগে আবার ছুটে এল, আবার উড়িয়ে দিল শকুনগুলোকে!

অসংলগ্ন এই দৃশ্যতিনটি মনে পড়ল কলকাতার সন্ধেবেলা খুব একটা পরিচিত দৃশ্য দেখে। সন্ধেবেলার আলোঝলমল নগরী, পথে-পথে অসংখ্য মনোহারী দ্রব্যের মেলা। ফিরিওয়ালাদের প্রত্যেকের কী সুন্দর সুরেলা গলা, প্রত্যেকের আলাদা ভঙ্গি, সেফটিপিন, বোতাম, কলম, রেডিমেড জামা, কাগজের কুমীর, চটিজুতো, ন্যাপথালিন, অদৃশ্যকালি — হঠাৎ রব উঠল, হাল্লা! হাল্লা! একনিমেষে লেগে গেল হুটোপুটি, যুদ্ধক্ষেত্রের মতো ব্যস্ততা — সেসব জিনিশ গুটিয়ে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল রাস্তা ফর্সা করে দিয়ে। কোথায় দেখা গেছে জাহাজের পালের মতো লাল পাগড়ির ঝিলিক, কিংবা নাকে এসেছে কালো গাড়ির পেট্রলের গন্ধ — অমনি চাপা গলায় চালাচালি হয়ে যাবে, হাল্লা! হাল্লা! কেউ-কেউ ছুটে যাবে পাশের অলিগলিতে, দু-একজন আবার উঠে দাঁড়াবে সামনের কোন বাড়ির রকে। রকে উঠে দাঁড়ালেও নিরাপদ, ফুটপাতটুকু ছাড়তে হবে শুধু। অর্থাৎ, সেই যে গল্প শুনেছিলাম — এক মাতালকে রাত্তিরবেলা পুলিশে তাড়া করেছে, ছুটতে-ছুটতে মাতাল হঠাৎ রাস্তায় একটা চাপাকল দেখতে পেয়ে — সেখানেই সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়ে জলে হাত রেখে বলেছিল, এখন আর তুমি আমাকে ধরতে পারছনা বাওয়া, এখন আমি জল-পুলিশের আন্ডারে। সেইরকম কোন ফুটপাতের ফেরিওলা একবার কোনক্রমে কোন বাড়ি বা দোকানের সিঁড়ির এক ধাপে বা রকে উঠে দাঁড়াতে পারলেই আর হাল্লা-জুজুকে ভয় নেই।

সাত দুগুণে চোদ্দর চার নামল, হাতে রইল পেন্সিল। আমার হাতে পেন্সিল রয়ে গেল। এক বান্ধবীর দুটি ছোট ভাইবোনকে খুশি করার জন্য দুটি ডটপেন্সিল কিনছিলাম। দাম চেয়েছিল একটাকা, অনেক কষাকষি করে চোদ্দ আনায় নামিয়েছি — এমনসময় হঠাৎ লোকটা ফুটপাতে বিছানো চাদরের চারটে খুঁট একসঙ্গে ধরে দৌড়ে পালিয়ে গেল। চোদ্দর চারও আমাকে নামাতে হলনা, দুটো পেন্সিল হাতে আমি বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে কী করব বুঝতে পারলামনা। দাম না-দিয়ে চলে যাব? কিন্তু বিবেকে পিঁপড়ের কামড় অনুভব করলাম। আজকাল ধর্মবোধের সঙ্গে আমাদের বেশ ভালোরকম একটা কম্প্রোমাইজ হয়ে গেছে। এই পেন্সিলদুটোর দাম যদি একশো টাকা হত, তবে দাম না-দেবার সুযোগ পেলে বিনাদ্বিধায় তদদণ্ডেই টুক করে পাশের গলিতে সটকাতাম নিশ্চিত। কিন্তু মাত্র চোদ্দ আনা বলেই বিবেকবোধ পাদ্রীর মতো জেগে উঠেছে। তাছাড়া একটি মেয়েকে খুশি করার মতো শুভকাজের শুরুতেই অধর্ম করা উচিত নয় ভেবে

আমি দাম দেবার মহৎ বাসনায় দোকানদারটির উদ্দেশে এদিক-ওদিক দৃষ্টি সঞ্চালন করলাম। দেখলাম, আমার মহাজনটি সেপাইয়ের হাতে ধরা পড়েছেন। আইনের প্রবল হাত তার কলার শক্ত করে চেপে ধরে আছে।

আমি আস্তে-আস্তে ওর কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালাম। ওকে পেন্সিলদুটি ফেরত দেওয়া কিংবা দাম মিটিয়ে দেওয়া সেই অবস্থায় ওর কেসের আরও বিপক্ষে যাবে কিনা বুঝতে না-পেরে একটু ইতস্তত করতে হল। সেইসময় বেশ চিত্তাকর্ষক সংলাপ-বিনিময় শুনতে পাওয়া গেল।

— এ সেপাইজি, কী হচ্ছে মাইরি। তুমি কাল আমাকে ধরেছিলে, আবার আজ ধরছ কেন?

— চল-না, তোর সঙ্গে একটু গপসপ হবে।

— না, ওসব ইয়ার্কি ভালো লাগেনা! পরপর দুদিন ধরবে, চালাকি নাকি? আজ তো জগাকে ধরার কথা!

— তা, আমি অত আস্তে-আস্তে আসছিলাম, তুই পালালিনা কেন? আমি তো বহুৎ টাইম দিয়েছি।

— আমাকে তো আজ ধরার কথাই ছিলনা!

— জগাকে তো দেখতে পেলামনা!

— তা বলে জগার পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাবে?

— তোকে একবার ধরে ফেলেছি, আর ছাড়ি কী করে?

— কাঁধ থেকে হাতটা তুলে নিলেই হয়!

— গাড়িতে ইন্সপেক্টার সাহেব বসে আছে।

— চলো তোমার ইন্সপেক্টারের কাছে, আমি মুকাবিলা করিয়ে দিচ্ছি।

সেপাই সমেত আমার ফিরিওলা গেল অদূরে প্রতীক্ষমাণ কালো গাড়ির সামনে। ড্রাইভারের পাশে বসে ইন্সপেক্টার সাহেব হাঁটু দোলাচ্ছিলেন। সকৌতুকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা আবার এসেছে!

ফিরিওলাটি বেশ চড়াগলায় ধমকের সুরে বলল, স্যার, এ কী অবিচার, আমাকে পরপর দুদিন ধরবে?

ইন্সপেক্টার মুচকি হেসে বললেন, তুমি ধরা পড়তে গেলে কেন?

— অন্যমনস্ক ছিলাম। তাছাড়া, আজ তো আমাকে ধরার কথাই ছিলনা!

— ধরা পড়েছই যখন, উঠে পড়ো, আর কী করবে!

— আমার মাসে পনেরো টাকা ফাইন দেবার কথা, এ মাসে আমার পনেরো টাকা হয়ে গেছে। আবার এ কী অন্যায়?

— আচ্ছা মুশকিল, তুই ধরা পড়লি তো আমি তার কী করব? এখন তো

উঠে পড়, পরে দেখা যাবে।

— না স্যার, তা হয়না, এ মাসে আমার পনেরো টাকা পুরিয়ে দিয়েছি। আর বেশি হলে অবিচার করা হবে, স্যার। আজ জগাকে ধরার কথা।

— জগা কোথায় ?

— ঐ ঘড়ির দোকানের রকে উঠেছে।

— হুঁ, জগা আজ ধরা দিলনা কেন ? ওর খুব বাড় বেড়েছে দেখছি। বড্ড বেশি চালাক হয়ে গেছে, না। আচ্ছা পরে ওকে মজা দেখাব। আজকে তুই-ই চল। আজ আমার দশটা কেস নিয়ে যাবার কথা।

— তা দশটা নেবেন, কলকাতায় কি ফিরিওলার অভাব ? পরপর দুদিন একজনকে কেন ! আপনারও তো স্যার দয়ামায়া আছে, পুলিশ হলেও তো স্যার, আপনিও তো মানুষ।

— আচ্ছা ঝঞ্ঝাট তোদের নিয়ে। আচ্ছা, ওর কাধটা ছেড়ে দে। শোন, তুই সেপাইয়ের হাত ছাড়িয়ে চোঁ-চা ছুট দিবি পাশের গলিতে। নিধিলাল তোর পেছুনে-পেছুনে ছুটবে তাড়া করে। তুই জোরে ছুটবি কিন্তু। ওর থেকে জোরে ছোটা চাই। নিধিলাল যদি তোকে আবার ধরে ফেলে — তা হলে কিন্তু তোর আজ আর ছাড়া নেই। যা দৌড়ো !

তারপর দৃশ্যটা বেশ সুন্দরভাবে অভিনীত হল। পোঁটলাটা কাঁধে নিয়েই ফেরিওলাটি বেশ জোরে সেপাইয়ের হাত ঝটকা দিয়ে ছাড়িয়ে ছুটল এঁকেবেঁকে। সেপাইটি পিছন-পিছন খানিকটা তাড়া করে গেল, তারপর অবিকল ভগ্নোৎসাহের ছাপ মুখে নিয়ে ফিরে এল। কালো গাড়িটা হুস করে ছেড়ে চলে গেল অন্য কোথাও হাল্লা করতে। দৃশ্যটি একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখে আমি যৎপরোনাস্তি সুখী হলাম। গত পনেরো বছর ধরেই দেখে আসছি বিকেলের দিকে ফুটপাতের হকার ফেরিওলাদের মধ্যে অকস্মাৎ পুলিশের আবির্ভাব। তক্ষুনি ছুটোছুটি, বেড়াল ইঁদুরছানা ধরার দু-একটি ছবি। কিন্তু এসব সত্ত্বেও পথের দোকানদারি একটুও কমেনি, বরং বেড়েই চলেছে। রং-বেরং-এর সওদায় রাস্তার শোভা বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে ক্রমশ। এখন কলকাতায় এমন শিকড়হীন দোকানীর সংখ্যা অন্তত পাঁচ হাজার এবং সস্তায় এদের কাছে থেকে ছোঁক-ছাঁক জিনিশপত্রের ক্রেতার সংখ্যা প্রতিদিন পঞ্চাশ হাজারের কম নয়। অর্থাৎ ফুটপাতের ফেরি কলকাতার অন্যতম একটি প্রতিষ্ঠান এখন। সুতরাং মাঝে-মাঝে আমার ভয় হত, ফুটপাত থেকে এদের যখন তোলাই যাচ্ছেনা, তখন পুলিশ হয়তো নিরুৎসাহ হয়ে এদের বিরক্ত করার আইনটাই তুলে নেবে। এরা সুরেলা গলায় নিজেদের জিনিশের গুণগান গাইবে নিঃশঙ্কভাবে। আমরা আর হল্লার অমন চমৎকার দৃশ্য মাঝে-মাঝে দেখতে পাবনা।

আজ বুঝতে পারলাম, সে ভয় নেই। আইন তোলা হবেনা। ও আইনটা রাখা উচিত পুলিশের রিক্রিয়েশনের জন্য। পুলিশের নীরস জীবনেও তো মাঝে-মাঝে খেলাধুলো, আমোদ-আহ্লাদের দরকার। হাল্লা গাড়ি নিয়ে এসে সেই আনন্দটুকু ওঁরা পান। পুলিশেরও তো মাঝে-মাঝে চোর-পুলিশ খেলতে ইচ্ছে হয়।

৫

এখানে মোক্ষদা কোথায় থাকে বলতে পারেন?

— কোন মোক্ষদা? নান্তির মা, না তকাইর দিদিমা? দুজন আছে এখানে। আপনি কোন জনকে চান?

মুশকিলে পড়লাম। বাড়ির ঝি বিনা নোটিসে চারদিন আসছেনা। একরাশ এঁটো বাসন ডাঁই হয়ে গেছে। বাড়ির তাড়নায় গ্রে স্ট্রিটের এক বস্তিতে ঝির খোঁজ করতে গিয়েছিলাম। ঝিকেই চিনি, তার সন্তান-সন্ততিদের ইতিহাস আমার জানার কথা নয়। সুতরাং কোন মোক্ষদাকে চাই তা বলতে পারলামনা।

খাটিয়ায় বসে-থাকা-বুড়ো লোকটি বলল, একজন মোক্ষদা থাকে ঐ ডানদিকের নিমগাছের পাশের ঘরটায়। আরেকজন পেছনের সেই অয়েল মিলের কাছে।

নিমগাছের তলায় খাপরার ঘরের দরজায় ধাক্কা দিলাম।

— কে?

— মোক্ষদা আছে?

— এখন হবেনা!

কী কথার কী উত্তর! কিন্তু ঐ দুর্বোধ্য উত্তরেও আমার কোন অসুবিধে হলনা। গলার আওয়াজেই বুঝতে পারলাম, উত্তরদাত্রী আমার উপলক্ষিত মোক্ষদা নয়। আরও বুঝতে পারলাম, ঐ কণ্ঠস্বরের অধিকারিণীর নিমগাছের তলায় বাস করা সার্থক!

দ্বিতীয় মোক্ষদার সন্ধানে একটু চেষ্টা করতে হয়েছিল। বস্তির পিছনে পানের দোকানে খোঁজ করতেই দেখিয়ে দিল। শুনলাম, সেই মোক্ষদার মায়ের দয়া হয়েছে। সামনের মঠকোঠার [illegible] থাকে। আমার উদ্যমের ওখানেই ইতি হওয়া উচিত ছিল। মনে মনে ও-ঝিকে তখন আমি বরখাস্ত করে দিয়েছিলাম। অতএব, তারপর আর ঐ নোংরা বস্তিতে সময়ক্ষেপ করার কোন

9469

দরকার ছিলনা। তবু কীরকম কুমতি হল। অনেকসময় যেমন আমাদের ডানদিকে যাবার দরকার, তবু বাঁদিকের রাস্তায় হাঁটি, অথবা টুথপেস্ট কিনতে বেরিয়ে সেটা না-কিনে সেই পয়সাতেই এক দোয়াত কালি কিনে আনি, সেইরকমই কোন যুক্তিতে সম্ভবত ভাবলাম, মোক্ষদাকে একবার দেখে যাই।

পানওলা হাঁক দিয়ে বলল, 'ছেদীলাল, এ ছেদীলাল, বাবুকে উপরে মোকসদার কুঠিতে লিয়ে যা।'— একটা বারো কি তেরো বছরের ন্যাংচা ছেলে আমাকে বলল, আসুন!

জিজ্ঞেস করলাম, 'মায়ের দয়া কবে থেকে হয়েছে রে ওর।'

— দু-চারদিন। আপনি এখেনটায় জুতো খুলে আসুন। ওসব জায়গায় জুতো পরে যেতে নেই।

আমি বললাম, 'থাম থাম, তোকে আর উপদেশ দিতে হবেনা। আমার এটা রবারের জুতো!'

নড়বড়ে হাতলহীন কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে চকিতে একটা কথা মনে পড়ল। অপ্রাসঙ্গিক যদিও। মনে পড়ল, দয়া আর কৃপা শব্দদুটির মানে প্রায় এক জানতাম, কিন্তু আসলে ও দুটো কত আলাদা। মা ষষ্ঠীর কৃপা আর মা শীতলার দয়া, এই দুই কথায় জমা-খরচের দুটো দিকই বুঝিয়ে দেয়।

দরজার কাছেই বসে ছিল, মুখ ফেরাতেই চিনতে পারলাম মোক্ষদাকে, মুখে খুব বেশি গোটা ওঠেনি। আমাকে দেখে তাড়াতাড়িতে বেরিয়ে আসতে যেতেই পাশের ঘর থেকে একজন বলল, 'ও কি মাসী, বেবিয়োনা, বেরিয়োনা, শেষে কি বাড়িসুদ্ধ সবাইকেই মারবে নাকি?' আমিও বললাম, 'থাক, থাক।'

দূর থেকেই উঁকি দিলাম ঘরের মধ্যে। দরজার কাছে মাথা রেখে আরেকটি যুবতী মেয়ে শুয়ে আছে, তার পাশে একটি আট-নবছরের বাচ্চা। মোক্ষদা প্রায় কেঁদে ফেলে বলল, 'আমার কিছুই হয়নি। দাদাবাবু, আমার মেয়ে বগলারই হয়েছে বড্ড বেশি গো। আমার সোমত্থ রোজগেরে মেয়ে।'

বগলা একটু নড়ে-চড়ে উঠল। তারপর একেবারে উঠে বসে বলল, 'মা একটা বিড়ি দে তো।'

— না, এখন খেতে নেই।

— একটা দে।

— বলছি তো, কটা দিন বিড়ি খেতে নেই।

— দে-না, তক্ক করিস কেন?

একটা বিড়ি মুখে দিল, তারপর পরপর কটা কাঠি ভেঙে আগুন ধরাল। মেয়েটার সারা মুখ ফোস্কায় ভরে গেছে। গলার আওয়াজটা তবু অহংকারী। বস্তিতে

ঢুকেই একটু-একটু সন্দেহ করেছিলাম, এখন এই মেয়েটির চোখ, এলো চুল, কাপড় পরার ধরন দেখেই মনে হল, ও নিশ্চয়ই মায়ের মতো ঝি-গিরি করেনা। ওর পেশা ওকে অহংকারী করেছে।

মেয়েটার মুখের দিকে একবার তাকিয়েই আমার বুকটা ধক্ করে উঠল। আমি ডাক্তার নই, কিছুই-না, কোন অলৌকিক ক্ষমতাও নেই, জ্যোতিষীও জানিনা, তবু, মেয়েটার মুখ দেখে একমুহূর্তে আমার মনে হল, ও আর বাঁচবেনা। মাত্র দু-একদিন। মৃত্যু ওর কপালে তারিখ লিখে গেছে। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম। আস্তে-আস্তে জিজ্ঞেস করলাম, 'ডাক্তার দেখিয়েছ?'

— না গো। আমাদের কি সে ক্ষমতা আছে। তাছাড়া, মায়ের দয়ায় ডাক্তার কী চিকিচ্ছে করবে? বাবাঠাকুর এসে মায়ের চন্নমের্ত দিয়ে গেছে আর ঝেড়ে দিয়ে গেছে।

— টিকে নিয়েছিলে?

— বাবাঠাকুরের দয়ায় ওসব আমাদের লাগেনা।

বস্তুত কোনরকম উপদেশ ঝাড়ার ইচ্ছে আমার ছিলনা। চলে আসবার আগে তবু জিজ্ঞেস করলাম, 'ও বাচ্চাটারও কি হয়েছে নাকি?'

— না, ওর হাম হয়েছে।

— কী করে বুঝলে?

— আমাদের এখানে কোন বাচ্চা ছেলেমেয়ের কখনও মায়ের দয়া হয়নি। বাবাঠাকুর বলে গেছেন, ওর কোন ভয় নেই।

আমি বললাম, 'তা বটে। অনেক পুণ্য করলে মায়ের দয়া পাওয়া যায়। ও আর এমন কী করেছে যে, মা ওকে দয়া করবেন।'

বগলা বলল, 'মা, বাবুর কাছ থেকে পাঁচটা টাকা চেয়ে নে। তোর মাইনের আগাম। বাবাঠাকুরকে আবার পাঁচ সিকে দিতে হবে পুজোর জন্য।'

মোক্ষদা বলল, 'কোন মুখে চাইব? এই তো এ মাসের মাইনে নেবার দুদিন পরেই জ্বরে পড়লাম। আমার কি আরকিছু পাওনা হয়েছে?'

বগলা আমার উপস্থিতির একটুও সম্মান না-দিয়ে গলায় ঝংকার তুলে বলল, 'তুই চা-না, বাবুদের কাছে দু-পাঁচ টাকার আবার দাম কী!'

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছিল প্রায়, 'টাকা তো সঙ্গে আনিনি!' কেননা যে দুদিন পরেই মারা যাবে তার জন্য টাকা খরচ করে কী লাভ? তবু পাঁচটা টাকা আমি পকেট থেকে বার করে চৌকাঠে ছুঁড়ে দিলাম; কারণ, একটা যুক্তি সেই মুহূর্তেই মাথায় এল। মনে পড়ল, কালীপুজোর সময় যখন বাজি পোড়াই — তখন তো জেনেশুনেই টাকাগুলো খরচ করি যে, একটু পরেই

বাজিগুলো আর থাকবেনা। এ-ও না-হয় একরকম বাজি পোড়ানো!

মোক্ষদা কুণ্ঠিতমুখে টাকাটা নিতে যাচ্ছিল, তার আগেই বগলা ছোঁ মেরে তুলে নিল। যেন, ও বুঝে নিয়েছে টাকাটা ওরই প্রাপ্য। আমি মৃত্যুর কথা ভেবেই দিয়েছি। কী জানি, আমি যে বুঝতে পেরেছি বগলা আর বাঁচবেনা — সেটা বগলাও বুঝতে পেরেছিল কিনা!

সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে আমি ছেদীলালের দুটি বাহুই ওর অলক্ষ্যে দেখে নিলাম। ছেলেবেলা থেকেই আমাদের বাহুতে যে গোল-গোল দাগগুলো আছে — ছেদীলালের তা নেই। যাক, একটা সমস্যা মিটল। আমার ধারণা ছিল, দুনিয়ার সব লোকেরই হাতে ঐ বিচ্ছিরি পেঁচার চোখের মতো দাগগুলো আছে।

এক প্যাকেট সিগারেট কিনে জানতে পারলাম, ঐ পানওলাই মাঠকোঠাটা এবং আদ্দেক বস্তির মালিক। জিজ্ঞেস করলাম, 'টিকে দেবার ব্যবস্থা করনি কেন? বস্তি যে এবার তোমার উজাড় হয়ে যাবে! টিকে তো বিনে পয়সায় দেয়।'

— খবর দিলেও আসেনা।

— গিয়ে তো নিয়ে আসতে পার?

— কী হবে বাবু! একবার এই বস্তিতে একজন ডাক্তার এসেছিল। তার পরদিনই রুগীটা মারা যায়! ডাক্তার চার টাকা ফিস ভি নিল, রুগীও নিল। আর আমরা এখানে ডাক্তার বোলাইনা। আমার বউয়েরও তো মায়ের দয়া হয়েছে, বাবাঠাকুর দেখছেন।

— বাবাঠাকুরের চিকিৎসায় বুঝি কেউ মরেনা?

— যার যখন নিয়তি টানে। কালকেই তো দুটো গেছে।

— বাবাঠাকুর থাকেন কোথায়?

— ঐ তো খালপারে মন্দির। আর আধাঘণ্টা বাদেই বাবাঠাকুর এসে যাবেন। আজ সক্কলে আলাদা করে পুজো দেব।

আমার হাতে অনেক কাজ ছিল। আর ওখানে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয়না। বরং অন্য জায়গায় গিয়ে নতুন ঝি-ঠাকুরের খোঁজ নেওয়া উচিত। কিন্তু বাবাঠাকুরটির সঙ্গে একবার দেখা করার অদম্য ইচ্ছে হল। এদের দেখলাম কারুরই কোন ক্ষোভ নেই, বাবাঠাকুরের ওপর অসীম নির্ভরতা। সুতরাং একবার সেই মহাপ্রভুকে চাক্ষুষ না-দেখলে চলেনা। বললাম, 'আমি ঐ চায়ের দোকানে আছি, বাবাঠাকুর এলে ছেদীলালকে দিয়ে কষ্ট করে আমায় একবার ডেকে পাঠাবে? আমি ওঁকে একবার প্রণাম করে যাব।'

বড় রাস্তার ওপারে চায়ের দোকানে বসলাম। আমার টিকে নেওয়া আছে, সুতরাং আমার ভয় নেই, তাছাড়া চা তৈরি হয় গরম জলে। খবরের কাগজটা

টেনে নিয়ে আমি ভিয়েৎনাম এবং কঙ্গোর সমস্যায় খুবই বিচলিত এবং মগ্ন হয়ে পড়লাম।

খানিকটা বাদে ছেদীলালের সঙ্গে বাবাঠাকুর নিজেই এলেন। মাটির ভাঁড়ে চা খেতে তাঁর আপত্তি নেই, সুতরাং দুজনে দুভাঁড় চা নিয়ে বসলাম। লোকটির চেহারায় ব্যক্তিত্ব আছে। রং কালো কিন্তু বেশ লম্বা। গলার আওয়াজ কর্কশ, খুব গভীরভাবে তাকাতে জানেন। সারা কপালে চন্দনের ছাপ, বুকেপিঠেও আছে কিনা বুঝতে পারলামনা; কারণ শীতের জন্যই বোধহয়, ফুলহাতা সোয়েটার পরে তার ওপর নামাবলি জড়িয়েছেন। বললাম, 'আপনাকে ওরা সবাই খুব মানে দেখছি।'

— আমাকে মানেনা। ঠাকুর-দেবতাকে মানে।

— তা আপনি ওদের টিকে নিতে বারণ করেছেন কেন?

— দেখুন, একটা কথা বলি। টিকে নিলে কিংবা ডাক্তারি ওষুধ খেলেই যে সব লোক বাঁচবে এ জোর করে বলতে পারেন? আপনাদের ও চিকিৎসা করলেও অনেক লোক বাঁচে অনেক লোক মরে। চরণামৃত খেয়েও অনেক লোক মরে আবার অনেক লোক বেঁচেও যায়। সুতরাং কোনটা ঠিক আপনি তা কী করে বলবেন?

— তা ঠিক। তবে পৃথিবীর অনেক দেশ আছে জানি, যেখানকার লোকেরা চরণামৃত একেবারেই খায়না, পায়না আরকি, বসন্ত রোগেও কেউ মরেনা।

— কথায়-কথায় পৃথিবীর কথা তুলবেননা। আর কোন দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের তুলনা চলে? কোথায় এমন —

— থাক, থাক। আপনি ঠিকই বলছেন। কিন্তু আমি বলছিলাম টিকের কথা। ওটা তো আর কোন ওষুধ নয়। ওটা হচ্ছে, মানে, কী বলে, অসুখটা যাতে না-হয় তার ব্যবস্থা। ঠাণ্ডা না-লাগাবার জন্য যেমন আপনি গলায় মাফলার জড়ান। অসুখটা হবার পর তো চিকিৎসার কথা। তার আগে অসুখটা না-হবার ব্যবস্থা করাই কি উচিতনা?

— ন্যায্য কথা। আমি কি বারণ করেছি? আমি মশাই আপনাদের ওসব টিকে-ফিকে বিশ্বাস করিনা। কিন্তু ওরা যদি নিজেই নেয়, তবে আমি বারণ করবার কে? কিন্তু দেয় কে? আপনি কি ভেবেছেন কলকাতার সব বস্তিতে করপোরেশনের লোক এসে টিকে দিয়ে যায়? মোটেইনা। ওসব আপনাদের জন্য। এদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে টিকে দেবার গরজ কারুর নেই! টিকে দিলেও যে বাঁচবে তার অবশ্য কোন মানে নেই, অন্য অসুখে মরবে। কর্মফল যাবে কোথায়!

— মরতে তো আপনাকেও হবে। নাকি আপনার মরার ভয় নেই?

— কাজ ফুরোলেই মরব। তার আগেওনা, পরেওনা।

— আপনার মনের জোর আছে দেখছি। আপনি যে এসব পক্সের রুগীদের ঘাঁটাঘাঁটি করছেন, আপনার ভয় করেনা?

— ভয় করলেই ভয়। কে কিসে মরবে তা তো কপালে লেখা হয়েই আছে!

— আপনি হাত দেখতে জানেন?

— না। আমরা পূজারী ব্রাহ্মণ। সাতপুরুষ ধরে কলকাতা শহরে মা শীতলার পূজারী। ওসব হাত দেখার কাজ আমরা করিনা। কেন হঠাৎ?

— আমি একটু-একটু জানি। দিন আপনার আয়ু বলে দিচ্ছি।

— আমি ভদ্রলোকের ডান হাতটা টেনে নিলাম। তারপর প্রায় জোর করেই পুরো হাত-ঢাকা সোয়েটারটা ঠেলে অনেকখানি ওপরে তুলে দিলাম। হাতে সদ্য টিকে নেবার দাগ। হয়তো গতকালই নিয়েছেন, একটু-একটু পেকে উঠেছে। আমি চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'সত্যিই আপনি গুণী লোক, পায়ের ধুলো দিন।'

বিষম অপ্রস্তুতভাবে বাবাঠাকুর বললেন, 'কী করব বলুন। আমি নিজেও মরতে চাইনা, ওদেরও মারতে চাইনা। কিন্তু ওরা যে মরতেই চায়।'

৬

নববর্ষের রাত্রে আমরা কয়েকজন শ্মশানে ছিলাম। না, মড়া পোড়াতে যাইনি। কোন উদ্দেশ্য ছিলনা। এমনিই।

গত বৎসরটাকে শ্মশানে পুড়িয়ে এলাম — এমন ছেলেমানুষী ধারণাও ছিল-না আমাদের। সারা রাত ঘুরতে-ঘুরতে কখন শ্মশানে পৌঁছে গেছি জানিনা। কেউ কোন পরামর্শও করিনি। হয়তো, শ্মশানের পাশে ভোর দেখতে ভালো লাগে, এমন গোপন অন্তর্নিহিত ইচ্ছে ছিল।

সেইখানে, ঐ জীবন্ত মেয়েটিকে দেখতে পাই। আলো ফোটেনি, কিন্তু গরম জিলিপি ভাজা শুরু হয়ে গেছে। 'জয় হোক মহারাজ', বলে শিবপ্রতিম সাধু, ভিখারি হয়ে দাঁড়াল। পাশে ষণ্ড। শ্মশানবন্ধুরা গাঁজা খেয়ে চোখ লাল করে সিনেমার গল্প নিয়ে হাসাহাসি করছে। ম্লান সেরে শীতে বাঁশপাতার মতো কাঁপতে-কাঁপতে ছুটে যাচ্ছে কয়েকজন। একজন চিৎকার করে গেয়ে উঠল 'যে জন গৌরাঙ্গ ভজে, সে হয় আমার প্রাণ রে —'। বাঙলা দেশের ভোরবেলার একমাত্র গান।

অনেকক্ষণ থেকেই একটা দুর্বোধ্য শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। অন্ধকারে শব্দের

মানেও ভালো করে বোঝা যায়না। একটু আলো ফুটলে যেন মনে হল একটি কচি মেয়ের গলা, আর একটি বৃদ্ধের। দুটোই খুব অসহায় ! আশেপাশে তাকিয়ে কিছু দেখতে পেলামনা। নতুন বছরের প্রথম দিনের সূর্যটাও ভালো করে উঠতে পারলনা, এমন কুয়াশা।

জিলিপির পর চা। চিনির বদলে আখের গুড়ের তৈরি হলেও অমৃতের মতন স্বাদ। কেননা, ঐ ভাঁড়ের সোঁদা গন্ধ। কেননা অমন শীতে শুকনো-হয়ে-আসা ঠোঁটে আগুন-আগুন গরম তাপ। বিশ্ববিখ্যাত হোটেলগুলিতে সারারাতব্যাপী যে নববর্ষ উৎসব হল, তার চেয়ে আমাদের উপভোগ কম ছিলনা, ঐ শেষরাত্রির ভাঁড়ের চায়ে।

'আপনাদের মড়া পুড়েছে ?' একজন জিজ্ঞেস করল আমাদের।

— না, একটু বাকি আছে।

— কতক্ষণ ?

— ঠিক জানিনা। কখন মরবে তা তো বুঝতে পারছিনা।

লোকটি বুঝতে না-পেরে বিরক্ত মুখে চলে গেল।

সিগারেট কিনতে চায়ের দোকানের উত্তাপ ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে সেই দৃশ্যটা দেখতে পেলাম। একটি আট-নবছরের মেয়ে। লোকটির সারা কপালে চন্দনের ছাপ, স্নান করার পর তখনও ভিজে কাপড়, অসম্ভব ভয়ার্ত মুখ। মেয়েটির দিকে হাত জোড় করে সে বলছে, 'হামাকে ছেড়ে দে, হামাকে ছেড়ে দে।' মেয়েটি খুঁ-খুঁ করে নিচু গলায় কাঁদছে।

দুষ্কৃতির গন্ধ পেয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম। একটু ভারিক্কি গলায় আমরা প্রশ্ন করলম, 'কী ব্যাপার ?'

লোকটি ব্যাকুলভাবে আমাদের দিকে ফিরে বলল, 'বাবু হামাকে রকসা করুন। হামি বে-ঝঞ্ঝাট মানুষ।'

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দেখলাম। কী অসাধারণ সুন্দর মেয়েটা। এমন রূপ, যার দিকে পাপী থেকে সাধু যে কেউ একবার তাকালে আর চোখ ফেরাতে পারেনা। যেন এইমাত্র ভোরবেলা একটি ফুল ফুটে উঠল। একমাথা ঝাঁকড়া চুল, ফেটে পড়ছে রং, ঝরনার জলের মতো টলটলে দুটো কালো চোখ। সামান্য একটা সুতির জামা পরে শীতে কাঁপছে, শীর্ণ হাতের মুঠিতে চেপে ধরেছে লোকটির কাপড়।

এমন দৃশ্য চট করে চোখে পড়েনা। আমরা ঘটনাটা জানবার জন্য তখুনি খুব ব্যগ্র হয়ে পড়লাম। অবাঙালি বৃদ্ধটি বলল যে, সে ভোর চারটের সময় রোজ গঙ্গাস্নান করতে আসে। আজও আসছিল, এমনসময় দেখতে পেল পাশে-পাশে ঐ মেয়েটি আসছে। সেই চিৎপুর থেকে সঙ্গে-সঙ্গে এল একটাও কথা না-বলে।

তারপর সে যখন কালী মাঈজির সেবার জন্য বাতাসা কিনতে দাঁড়িয়েছিল, মেয়েটিও তখন দাঁড়িয়েছে। অমন লছমির মতো সুন্দরী মেয়েটিকে দেখে তার মায়া হয়েছিল, সে খোঁকিকে নাম জিজ্ঞেস করেছিল। মেয়েটি কোন উত্তর দেয়নি, শুধু শীতে কেঁপেছে। সে তখন দুটো মেঠাই কিনে দিয়েছে ওকে। তারপর স্নান সেরে মন্দিরে এসে মাকে প্রণাম করে শিবের মাথায় জল দিয়ে এসে দেখে মেয়েটি তখনও দাঁড়িয়ে। ওকে দেখামাত্র মেয়েটা এসে ওর পাশে আবার চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বৃদ্ধটি তখন মেয়েটার থুতনি ধরে একটু আদর করে বলেছে, 'খোঁকি আপনা বাবা-মার কাছে যাও, একেলা ঘুরসো কেন ?' মেয়েটি তখনও কোন উত্তর দেয়নি। তখন তার মনে হয়েছে, আ-হা, মেয়েটা বুঝি বাপ-মা হারা। নইলে কেউ শীতের রাতে ছেড়ে দেয়। সে তখন দয়া করে মেয়েটাকে একটা চৌয়ান্নি দিয়েছে। কিন্তু, তারপর থেকে মেয়েটা আর তার সঙ্গ ছাড়ছেনা। 'হামার কী বিপদ বাবু, হামি একে নিয়ে কোথায় যাব ?'

বৃদ্ধের কথা শুনতে-শুনতে ভয়ে আমার বুক কেঁপে উঠছিল। আমার মনে হচ্ছিল, তখুনি আমার ও জায়গা ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত। হারানো ছেলেমেয়েদের মুখ দেখতে আমার বিষম অস্বস্তি হয়। রাস্তায় দুর্গাপূজার প্যান্ডেলে, একজিবিশনে — কোথাও কোন হারানো ছেলেমেয়ের কথা শুনলেই আমি মুখ ফিরিয়ে নিই। ঐ হারানো মুখ আমি দেখতে চাইনা। তাহলে, সারাদিন ঐ মুখ আমার মনে গেঁথে থাকে, কিছুতেই ভুলতে পারিনা। ঐসব হারানো ছেলেমেয়েরা বাড়িতে সত্যিই কখনো আবার পৌঁছয় কিনা জানিনা। অন্তত আমাদের সাধ্য নেই ওদের ফিরিয়ে দেবার। খবরের কাগজের হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশও কখনো পড়িনা আমি। কাগজে শুধু নিরুদ্দেশ-সংবাদই থাকে — কখনো ফিরে আসার খবর থাকেনা। মাকে মৃত্যুশয্যায় ফেলে বাবা কিংবা দিদিমার অন্নজল ত্যাগ করিয়ে ঐ যারা নিরুদ্দেশ হয়, তারা আবার সত্যিই কোনদিনই ফিরে আসে কিনা তা না-জানতে পেরে এমন তীব্র অস্বস্তি হয় আমার। তার চেয়ে ওসব কথা না-জানাই ভালো।

কিন্তু এখানে আর উপায় নেই। এখানে মেয়েটির মুখ দেখে ফেলেছি। অমন এক-বিশ্বের মায়া-মাখানো মুখ। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, 'খুকি, তোমার নাম কী ?'

মেয়েটি একটা তীক্ষ্ণ কর্কশ আঁ-আঁ শব্দ করল। মেয়েটি কালা এবং বোবা। বিপন্নভাবে দৃঢ়মুষ্টিতে চেপে আছে লোকটার কাপড়। ভোরবেলার হাওয়ায়, আমাদের তখন খুবই শীতের কাঁপুনি লাগার কথা — কিন্তু মেয়েটার গায়ে শুধু একটা পাতলা জামা দেখে আমরা শীত অনুভব করতে ভুলে গিয়েছিলাম। আমাদের কারুর গায়ে আলোয়ান ছিলনা। মেয়েটির জন্য কিছু-একটা করা

দরকার। কিন্তু কী করব আমরা বুঝতে পারলামনা। ব্যাকুল চোখে তাকিয়ে মেয়েটি চাইছে একটা আশ্রয়, একটা ঘরের ভিতরের তাপ।

বৃদ্ধটি বলল, 'হামিকে বাঁচান বাবু। এ আমার কী বিপদ হল। আভি গিয়ে মালিকের দুকান না-খুললে মালিক খেঁচাখেঁচি করবে। লিকিন, একে জোর করে ছাড়িয়ে কী করে যাই সক্কালবেলা, একী মায়া ভগবানের।'

আমরা বললাম, 'এ তো তোমার সঙ্গেই যেতে চায়।'

'না, বাবু, হামি একলা মানুষ, দুকানঘরে মাথা গুঁজরে থাকি। একে কোথায় নিয়ে যাব?' লোকটার গলায় নিষ্ঠুরতা ছিলনা, ছিল অসহায়তা।

— যাও-না, মেয়ের মতো মানুষ করবে।

— এ বাঙালির মেয়েকে নিয়ে কোথা যাব।

— বোবা আবার বাঙালি কী?

— না বাবু, হামার উপায় নেই।

তারপর সে মেয়েটির দিকে ফিরে কাকুতিভরা গলায় বললে, 'হামাকে দয়া কর মা। ছেড়ে দে। এই-নে আর একটা চৌয়ান্নি। সক্কালবেলা হামাকে অধর্ম করাসনি।'

মেয়েটির জন্য আমরাও অনুভব করছিলাম। কিন্তু আমাদেরও ঔদার্য এত বেশি নয় যে, একে নিজের দায়িত্বে সঙ্গে নিতে পারি, বা নিজেদেব বাড়িতে নিয়ে যেতে পারি। রাস্তায় তখন কিছু লোক চলতে শুরু করেছে। কয়েকজন কৌতূহলী হয়ে উঁকি মেরে দেখে যেতে লাগল। 'আহা, এমন ফুটফুটে মেয়েটা কাদের গো, হারিয়ে গেছে বুঝি?'

আমরা জনে-জনে অনুনয় করতে লাগলাম, কেউ মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চায় কিনা। কেউ রাজি নয়। মায়া সবারই আছে — কিন্তু আজকাল আর দয়ামায়ার আবেগে সামর্থ্যচিন্তা ছাড়িয়ে যায়না।

অত ভোরবেলা মেয়েটির জন্যে কী করা সম্ভব আমরা ভেবেই পেলামনা। বিশেষত যে মেয়ে কোন কথা বলতে পারেনা। বাবা-মার ঠিকানা খুঁজে বার করার উপায় নেই — চেহারা দেখলে মেয়েটিকে ভালো ঘরেরই মনে হয়। অব্যক্তভাবে আমরা সকলেই এ কথা ভাবলাম যে এবার আমাদেরও আস্তে-আস্তে সরে পড়তে হবে। এ ছাড়া উপায় নেই। মহত্ত্ব দেখাতে গিয়ে কি এই মেয়েটার বোঝা আমাদের ঘাড়ে চেপে যাবে? মেয়েটি কী বুঝলে জানিনা, সে বৃদ্ধটির কাপড় ছেড়ে হঠাৎ এসে আমার হাত চেপে ধরল। বোবা হলে কি মনের ভাষা বুঝতে পারা যায়? কী ঠাণ্ডা আর নরম হাত, ঐ হাত ছাড়িয়ে যাবার শক্তি পৃথিবীর কারুর নেই বোধহয়। বুঝতে পারলাম মাড়োয়ারিটি কেন এতক্ষণ এমন অসহায় বোধ করছিল।

আমার হাত ধরামাত্র তখুনি আমার মনে পড়ল পুলিশের কথা। পুলিশের হাতে তো হারানো ছেলেমেয়েদের সঁপে দেওয়া যায়। তাহলে তো মেয়েটিও বাঁচবে, বাঁচবে আমাদেরও বিবেক নামক গোলমেলে পদার্থটি।

মেয়েটিকে হাঁটিয়ে নিয়ে চললাম আমাদের সঙ্গে, ওর ভাষা তো জানিনা আমরা কেউ। মেয়েটা অনবরত গলা দিয়ে খুঁ-খুঁ করে কান্নার মতো আওয়াজ করছে। ওর চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে বললাম, 'ভয় নেই, ভয় নেই।' কী বুঝল ও-ই জানে।

থানা পর্যন্ত যেতে হলনা। কাছেই একটি কনস্টেবলকে দেখতে পেলাম। হয়তো সে সারারাত এই শীতে জেগে পাহারা দিচ্ছে। সারা মুখে মাথায় ফেট্টি বাঁধা, কান জড়ানো, শুধু চোখদুটি আর নাকের আগাটুকু খোলা। আমরা সদলে এর সামনে দাঁড়ালাম। সারা রাত জেগে যারা একলা পাহারা দেয় — তারা সবসময় কী ভাবে, এ সম্বন্ধে আমার অনেক দিনেরই কৌতূহল। কী করে ওরা ঘুম তাড়ায়? কার যেন উপন্যাসে পড়েছিলাম, সম্ভবত দুমার, বাস্তিলের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে কারাকক্ষে একজন কয়েদী পাগল হয়ে যাবার হাত থেকে নিজেকে কীভাবে রক্ষা করেছিল, কীভাবে সবসময় নিজেকে ব্যস্ত রাখত। সে ছটা আলপিন ছুঁড়ে দিয়েছিল সেই অন্ধকার ঘরে — তারপর, দিনের পর দিন ব্যগ্র হয়ে খুঁজত সেইগুলো অন্ধকারে, কয়েক মাস পর খুঁজে পেলে, সবকটা আলপিন আবার ছড়িয়ে দিত; আবার খোজা। কলকাতার একটি পুলিস কনস্টেবল একদিন মধ্যরাত্রে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, সেদিন কী তিথি। হয়তো সে প্রত্যেক রাত্রেই সেদিনের তিথি নিয়ে গণনা-গবেষণা, নিজের সঙ্গে তর্কাতর্কি করে কাটাত। কিন্তু, আজ যে পুলিশটির দেখা পেলাম, এর মতো দার্শনিক পুলিশ আমি কখনো দেখিনি। সে অল্পক্ষণেই আমাদের চোখ খুলে দিল।

তার সামনে পুরো ঘটনাটি ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে বিবৃত করে আমরা তাকে অনুরোধ করলাম, মেয়েটিকে থানায় নিয়ে যেতে। পুলিসটি একটি কথাও বললনা। সোজা চোখ মেলে তাকিয়ে রইল। যেন একটি পাথরের মূর্তি। আমরা রেগে গেলাম। কড়া গলায় বললাম, 'কি, কথা কানে যাচ্ছেনা?' লোকটি ধীরে-সুস্থে কান থেকে তিন ফেট্টি মাফলার খুলে ফেলে বলল, 'আবার বলুন!' অর্থাৎ সত্যিই তার কানে কথা যায়নি। এবং সে বাঙালি। গোড়া থেকে আবার বলতে হল। পুলিশটি একটুও বিচলিত না-হয়ে ঠাণ্ডা গলায় যেন একটু ব্যঙ্গের সুরে বলল, 'আপনারা তো যা করার করেছেন, এবার বাড়ি যান।'

— কেন? ওকে থানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কিনা আমরা দেখতে চাই।

— কোন লাভ নেই।

— তার মানে ?

— কী দরকার থানায় নিয়ে গিয়ে ?

— আপনাকে তা কে বিচার করতে বলেছে ? নিয়ে চলুন।

লোকটি মাথা থেকে আরেকটা ফেট্টি খুলে ফেলল। তারপর আগের চেয়েও নিরুত্তাপ গলায় বলল, 'কেন রাগ করছেন ?'

আমরা লোকটির অদ্ভুত ব্যবহার দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। মেয়েটা শীতে কাঁপছে, সেদিকে ও ভ্রূক্ষেপও করছেনা। অন্তত থানায় গেলে ঘরের গরমটুকু পেত। আমরা বললাম, 'আপনি ওকে নিয়ে যাবেন কিনা?'

লোকটি এবার চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, 'কোনও লাভ নেই। আমি সাতদিন ধরে ওকে দেখছি — ছুটে-ছুটে যে-কোন লোকের সঙ্গে যেতে চায়। কেউ নেয়না। ও হারিয়ে যায়নি। বাপ-মা নিশ্চয়ই ওকে ইচ্ছে করে ছেড়ে দিয়েছে। ও আস্তে-আস্তে ভিখিরি হয়ে যাবে — বোবা বলে বরং ভিক্ষে বেশিই পাবে — তা ছাড়া দেখতেও সুন্দর। ওর চলে যাবে।'

তারপর আমাদের দিকে চোখ ফেলে আবার বলল, 'আপনারা ওকে দেখে এত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন কেন ? ওর বয়সী ভিখিরি আগে দেখেননি ? আজ হঠাৎ আপনাদের মায়া উথলে উঠল কেন ? কিন্তু যাদের চোখে দেখতে পাননি দেশে তো এরকম হাজার-হাজার ভিখিরি আছে. ওকে আজ চোখে দেখলেন বলে, আর যারা...

আমি সঙ্গে-সঙ্গে এক ঝটকায় মেয়েটির হাত ছাড়িয়ে নিলাম। আমরা বন্ধুরা চোখাচোখি করলাম। আজ হারায়নি, মেয়েটা তাহলে আগেই হারিয়ে গেছে ! ভোরের মায়া কেটে যাচ্ছে, আমরা এবার দিনেরবেলার বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন কাজের মানুষ হয়ে পড়ি।

বোবারা মনের ভাষা ঠিকই বোঝে। মেয়েটি আমাদের বুঝতে পেরে ওর সেই দুর্বোধ্য গলায় কেঁদে উঠল। আমরা কেউ ঘড়ি দেখতে লাগলাম মনোযোগ দিয়ে, কেউ পকেটে হাত ঢুকিয়ে মন নিবিষ্ট করলাম — যেন মনটা ঢুকে গেছে পকেটে, কেউ তাকালাম আকাশের দিকে যাতে মেয়েটার সঙ্গে আমাদের আর চোখাচোখি না-হয়। মেয়েটা একটা পাগলা ইঞ্জিনের মতো কর্কশ চিৎকারে কাঁদতে-কাঁদতে ছুটে গেল হঠাৎ। আমরা ওকে দূরের কুয়াশায় মিলিয়ে যেতে দেখলাম।

হাঁটতে-হাঁটতে আমরা চলে এলাম বড় রাস্তায়। শহর জেগে উঠেছে পুরোপুরি। এবার আমরা বন্ধুরা এক-একজন এক-একদিকে চলে যাব। কাল দিনেরবেলায় আমরা যেরকম মানুষ ছিলাম, আজও সেইরকমই রয়ে গেলাম। মাঝখানে এই শেষরাত্তিরের ঘটনাটুকু কেউ আর কখনও আলোচনা করবনা।

৭

মাস্টারমশাই ছাত্রীকে পড়াচ্ছিলেন, এমন সময় দপ করে আলো নিবে গেল। ছাত্রী খাতায় নোট লিখছিল, মাস্টারমশাই ডিক্টেট করছিলেন, আলো নিবতেই মাস্টারমশাই অকস্মাৎ চুপ করে গেলেন। ছাত্রী মুখ তুলে জানলার বাইরে দেখল, যতদূর দেখা যায় অন্ধকার, এমনকী আকাশের চন্দ্র-নক্ষত্রসমাজও বিদ্যুৎ-সংযম পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করছে। পরবর্তী ঘটনা বিবৃতির আগে, দু-একটি প্রাসঙ্গিক আলোচনা করা যায়।

আলোটা দপ করে নিবে গেল। এই বাক্যটি দিয়েই অধিকাংশ সময় আলো নিবে যাবার বর্ণনা হয়। যদিও, যখন আলো নেবে, তখন দপ করে কেন, কোন-রকম শব্দই আমি কখনও শুনিনি। বৈদ্যুতিক আলো নেবে নিঃশব্দে, কোম্পানির কোন নোটিশও না-পেয়ে। কোন শব্দ হয়না, তবু বর্ণনার সময় 'দপ করে' শব্দটা ব্যবহার করতে হয়। অর্থাৎ বিদ্যুতে পুরো অভ্যস্ত হইনি এখনও, আমাদের মনে আছে আজও প্রদীপ-যুগের স্মৃতি। প্রদীপের শিখা হঠাৎ হাওয়া লেগে কয়েকবার কেঁপে, সত্যিই একটা শব্দ করে, দপ্ করে নিবে যেত। এখন, মাথার ওপর চড়া বালব, বিনা ঝড়-জলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে নিবে যায়, তবু আমরা দপ্ করে প্রদীপ নিবে যাওয়ার শব্দ পাই। বিজলির অভাবে সারা শহর অকালে অন্ধকার হয়ে গেল, কিন্তু খবরের কাগজে তার বর্ণনা 'শহর নিষ্প্রদীপ'। মনে-মনে হয়তো আমরা প্রদীপের যুগে ফিরে যেতে চাই, গেলে ভালো হত, জীবন হয়তো আরেকটু সুস্থ হত রহস্যময় আলো-আঁধারিসহ ; এখন হয় কর্কশ চড়া আলো, অথবা ছিদ্রহীন অন্ধকার। যাক।

মাস্টারমশাই যুবা-পুরুষ, সদ্য এম. এ. পাশ, ভদ্র, লাজুক। ছাত্রীকে তিনি মন দিয়ে পড়াতেই আসেন, নবেল-নাটকের গৃহশিক্ষকদের মতো ছাত্রীর হৃদয় নিয়ে টানাটানি করার বিন্দুমাত্র প্রচেষ্টা নেই। ছাত্রীটি বি. এ. পরীক্ষা দেবে, নম্র, সুন্দরী, অপ্রগলভা। পড়াশুনো ছাড়া মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে আর যে দু-চারটি কথা হয়, সেগুলি সরল কৌতুকের, কেউ কারুর সীমান্ত আক্রমণ করেনা। বাড়ি, বুঝতেই পারা যায়, ধনী পরিবারের, এবং যুবতী কন্যার জন্য যুবক শিক্ষক নিয়োগ করা থেকে অনুমান করা যায়, আধুনিক, উদার, রুচিমান।

অমন হঠাৎ আলো নিবে যেতেই কিছুক্ষণ দুজনে সম্পূর্ণ নিঃশব্দে বসে রইলেন। একটু পরেই মাস্টারমশাই অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন, এখন তাঁর কী করা উচিত কিছুতেই ঠিক করতে পারলেননা। এখন কি তাঁর চলে যাওয়া উচিত ?

কিন্তু, যদি পাঁচ মিনিট পরেই আলো জ্বলে ওঠে ? তিনি এসেছেনও মাত্র দশ মিনিট আগে। হয়তো একটু অপেক্ষা করে দেখা উচিত, আলো জ্বলে ওঠে কিনা। অথচ অন্ধকার ঘরে একটি যুবতীর সঙ্গে বসে থাকা শোভন কিনা, বুঝতে পারলেন-না। অন্ধকার আমাদের দেশে ট্যাবু, আলাদা ঘরে যুবতী ছাত্রীকে নির্জনে পড়ানো যায়, কিন্তু অন্ধকারে বসে থাকা ? ওঁর কি উচিত উঠে গিয়ে জানলার পাশে দাঁড়ানো, অথবা বাইরে গিয়ে, অথবা মেয়েটিকে বলা, তুমি একটু বাইরে যাও ! কিন্তু মেয়েটি চুপ করে বসে আছে। অন্ধকারে তার মুখ দেখা যাচ্ছেনা, একটুও টের পাওয়া যাচ্ছেনা তার চোখের ভাষা। যখন দুজনের মনেই কোন পাপ নেই, তখন, শুধু এই অন্ধকারের জন্যেই মেয়েটিকে বলা, 'তুমি একটু বাইরে যাও' — যদি খুব বিশ্রী শোনায়, যদি মনে হয় মাস্টারমশায়ের মনে পাপ ছিল বলেই এ কথা বললেন ! যদি ওঁরা ভাবেন, লোকটা লেখাপড়া শিখেও বর্বর, সংস্কৃতিহীন, নইলে অমন ইঙ্গিত করে ? শুধু বসে থাকায় কী দোষ ? আমার তো কোন দোষ নেই, মাস্টারমশাই ভাবলেন, কিন্তু এরকম-ভাবে বসে থাকাটাই দোষের কিনা আমি কী করে জানব ? দারুণ অস্বস্তিতে লাজুক মাস্টারমশাইয়ের মাথা ঝিনঝিন্ করতে লাগল। চেয়ারে বসে থাকা খারাপ, না উঠে যাওয়া খারাপ দেখাবে, না মেয়েটিকে উঠে যেতে বলা খারাপ — এই সংশয়ে তিনি পাথর হয়ে গেলেন।

মেয়েটি চুপ করে বসে ছিল। একবার তার চেয়ার সরাবার শব্দ হল। চেয়ারটা সামনে টেনে আনার না পিছনে সরিয়ে নেওয়ার, তা বোঝা গেলনা। মেয়েটি কী ভাবছে কেউ জানেনা। হয়তো সে কৌতুকে হাসছে মিটিমিটি অথবা অনার্সের যে প্রশ্নটির নোট লিখছিল, সেটাই ভেবে যাচ্ছে মগ্ন হয়ে। মুখ দেখলেও মেয়েদের মনেব কথা জানা যায়না, আর অন্ধকারে ? তাছাড়া, সমুদ্র ও অন্ধকার — এই দুই বিরাটের সামনে মেয়েরা সম্পূর্ণ বদলে যায়। অত্যন্ত চেনা মেয়েও যখন সমুদ্রে স্নান করতে নামে, তখন আর তাকে চেনা যায়না, যেন শরীরে খেলে যায় অসংখ্য বিদ্যুৎ, অসীম রহস্যের সঙ্গে অসীমা হয়ে খেলা করে। পুরুষরা জলে নামলেও পুরুষ, কিন্তু যে কোন মেয়ে জলে নেমেই জলকন্যা। তেমনি অন্ধকার। অন্ধকারে মেয়েরা কী ভাবে কেউ জানেনা। সব মেয়েকেই সকালবেলা একরকম দেখতে, বিকেলবেলা আরেকরকম, কিন্তু অন্ধকারে মেয়েদের কীরকম দেখায়, আরও রূপসী না হঠাৎ খুব কুৎসিত — আজ পর্যন্ত কোন পুরুষ জানতে পারেনি। মেয়েটি একবার শুধু বলল, উঃ কতক্ষণে যে —। মাস্টারমশাই একটা অস্ফুট শব্দ করলেন। আবার দুজনে চুপ।

মেয়েটির মা রেফ্রিজারেটারে পুডিং জমেছে কিনা দেখছিলেন, এমনসময়

আলো নিবে যেতেই তিনি ভাবলেন, শুধু কি এ বাড়ি ? তৎক্ষণাৎ শুনতে পেলেন সমস্ত পাড়া জুড়ে অন্ধকারের মধ্যে একটা সোরগোল। আজকাল যা হয়েছে, কথা নেই বার্তা নেই — এই ভেবে তিনি গাড়িবারান্দার ওপরে এসে দাঁড়ালেন। উনি এখনো ফেরেননি, এর মধ্যে এসে যাওয়ার কথা, কিন্তু গাড়ি নিয়ে যদি বেরিয়ে পড়ে থাকেন, তবে এই অন্ধকার রাস্তায় গাড়ি চালানো ! কিন্তু একটু বাদেই তিনি বুঝতে পারলেন, ঠিক স্বামীর জন্য চিন্তা করছেননা তিনি। অন্য একটা কী বিষয়ে যেন তিনি উদ্বিগ্ন, কিন্তু, সেটা মনে পড়ছেনা। কিছুতেই মনে আসছেনা। ও-হো। হঠাৎ মনে পড়ল, রেবা মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়ছে। সঙ্গে-সঙ্গেই আরকিছু না-ভেবে চলে এলেন রেবার ঘরের দিকে। দরজার কাছে এসেই কিন্তু থমকে দাঁড়ালেন। রেবার ঘরের দরজা খোলা, কিন্তু ভারি পরদা ঝুলছে। ভিতরে অন্ধকার, কোন শব্দ নেই। এ সময় কি তাঁর ঘরে ঢোকা উচিত ? ওদের পড়বার সময় তিনি কোনদিন ও ঘরে ঢোকেননা, আজ অন্ধকার হয়েছে বলেই তিনি ঢুকলে কি ওরা ভাববেনা যে একটা কুৎসিত সন্দেহ এসেছে ওঁর মনে। ছি ছি! নিজের মেয়ে রেবাকে তিনি চেনেন, সেদিক দিয়ে কোনরকম দুশ্চিন্তা নেই। আর, যে পড়াতে আসে, সেই শুভেন্দু, গরিবের ছেলে হলেও বেশ ভদ্র, কোনদিন মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলেনা। অন্ধকার হয়েছে বলেই ঘরে ঢুকে পড়াটা সত্যি খুব খারাপ হবে। তবু মন থেকে অস্বস্তি গেলনা। তিনি তো খারাপ ভাবছেননা একটুও। কিন্তু চাকরবাকর কিংবা পাড়া-প্রতিবেশী যদি অন্ধকার ঘরে মাস্টার আর ছাত্রী বসে আছে এই নিয়ে আড়ালে হাসি-ঠাট্টা করে। ভাবতেও তাঁর শরীর জ্বলে গেল। একবার ভাবলেন, মেয়েকে বাইরে থেকে ডাকবেন। কিন্তু সেটা আরও খারাপ দেখাবে, ওরা ঠিক বুঝতে পারবে, ওরা কি ভাববেনা যে তাঁর মনটা নোংরা ? একটা উপায় ছিল, যদি একটা মোমবাতি নিয়ে ওদের ঘরে দিয়ে আসা যেত ! সেটা খারাপ দেখাতনা। কিন্তু, পরপর ক'দিনই আলো নিবছে, রোজই মোমবাতি কেনার কথা ভাবছেন, অথচ, দিনেরবেলা মনেই পড়েনা। এজন্য নিজের ওপরই রাগ হল তাঁর। কী করবেন, না ভাবতে পেরে একটু সরে ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। খানিকটা পর মাস্টারমশাই বললেন, আরেকটু দেখি, যদি না-জ্বলে, আমি তাহলে চলে যাব। মেয়েটি কোন উত্তর দিলনা। মাস্টারমশাই আবার বললেন, আমি এখানে সিগারেট খেলে তোমার অসুবিধা হবে ?

— কী আশ্চর্য, এতক্ষণ ধরাননি কেন ? এই কথা বলে ছাত্রীটি খিলখিল করে অনেকক্ষণ ধরে হাসতে লাগল।

ফস্ করে দেশলাই জ্বলে উঠল। কাঠিটা যতক্ষণ জ্বলে, ধরে রেখে, তারপর

সেটা ফেলে দিলেন চায়ের প্লেটে। তারপর সিগারেট টানতে গিয়ে মাস্টারমশাই সবিস্ময়ে লক্ষ করলেন, তাঁর হাত কাঁপছে। আশ্চর্য তো, কোন কারণ নেই, তবু। তারপরই তিনি ভাবলেন, রেবাকে এই সামান্য কথাটা জিজ্ঞেস করায় এতক্ষণ ধরে হাসছে কেন?

৮

আমাদের বাড়িতে একটা বিড়াল আছে। বিড়াল ঠিক নয় বিড়ালী। বছর বারো-চোদ্দ বয়েস হবে। এই ক'বছরে ওর বাচ্চা হয়েছে আশি থেকে একশোটা। এই বাচ্চাগুলো গেল কোথায়? আমাদের বাড়িতে একটাও নেই।

বিড়াল অনেকে ভালোবাসেন, আবার অনেকেই বিড়াল দেখলে চেয়ার-টেবিলে উঠে নৃত্য করেন। ঐ আত্মসুখসর্বস্ব জন্তুটাকে দেখলে আগে আমারও ঘৃণা হত। ছেলেবেলায় গুলতি দিয়ে টিপ্ করা কিংবা কালীপুজোর সময় ল্যাজে ফুলঝুরি বেঁধে দেওয়া ছিল আমার প্রিয় খেলা।

আমাদের বিড়ালটা আমাদের বাড়িতে এসেছিল অদ্ভুতভাবে। রাত্তির বেলা হঠাৎ দেখি ঘরে ঢুকে আছে। তখন খুবই বাচ্চা — আমরা সকলে তাড়া করছি বার করে দেবার জন্য, একটা সাদা উলের বলের মতো বিড়ালটা ছুটোছুটি করছিল। হঠাৎ একসময় ঘরের মাঝখানে এসে চিৎপটাং হয়ে শুয়ে প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাত দুখানা তুলে এমন জুলজুল্ করে তাকাল যে আমরা তৎক্ষণাৎ হেসে ফেললাম। মা বললেন, 'থাক, থাক্, আজ আর তাড়াতে হবেনা।' আমার মা বিড়াল পছন্দ করতেননা কখনও, কিন্তু বাচ্চাটা তারপর দু-তিনদিন মায়ের পায়ে-পায়ে ঘুরে অবলীলাক্রমে মায়ের আদর কেড়ে নিলে। বাবা ছিলেন অত্যন্ত গম্ভীর এবং রাশভারী। আমরা সবাই ভয় করতাম। মাঝে-মাঝে বাবা জলদকণ্ঠে বাচ্চাটাকে ধমকে দিতেন। কিন্তু তবুও বাচ্চাটা যেদিন নিতান্ত অবহেলার সঙ্গে বাবার ব্যক্তিত্বকে অবজ্ঞা করে বাবার থালা থেকেই ইলিশ মাছের মুড়ো তুলে নিল — সেদিন আমরা যথার্থই খুশি হয়েছিলাম। সেই থেকে বিড়ালটা আমাদের বাড়িতে রয়ে গেছে।

এক বিখ্যাত ফরাসি লেখকের উপন্যাসে পড়েছিলাম, মানুষ জন্তু-জানোয়ার পোষে নিজের অহংকারে সুড়সুড়ি দেবার জন্য। প্রত্যেক মানুষই অন্য কোন একজনের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। যাকে সে খাওয়াবে, আদর করবে এবং দরকার হলে পদাঘাত করবে। আগে ক্রীতদাসের উপর এরকম করা যেত।

ক্রীতদাস-প্রথা উঠে যাবার পর অনেকে তখন স্ত্রীর উপর এই বীরত্ব ফলাতেন। এখন স্ত্রীরাও স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা জেনে গেছেন। বরং এখন পুরুষদেরই ক্রীতদাস বানাবার চেষ্টা তাঁদের। সুতরাং এখন জন্তু-জানোয়ারের ওপরই এই ইচ্ছেটা মেটানো যায়। অনেকে মহা আহ্লাদে কুকুর বেড়াল পাখি পোষে। কুকুর পোষা তো প্রায় সামাজিক প্রথার মতো দাঁড়িয়েছে।

আমার এক বন্ধুর পোষা বিড়ালের নাম শ্বেতকরবী। নাম শুনেই ভালোবাসার বহর বোঝা যায়। কৃষ্ণকলি, দধিমুখী, সুন্দরী এমন নামও শুনেছি। এক অপুত্রক দম্পতির তিনটি মার্জার সন্তান দেখেছি — যারা আমাদের চেয়ে অনেক ভালোভাবে খেয়ে-শুয়ে আছে।

আমাদের বিড়ালটা ঠিক পোষা নয়, বাড়িতে আছে এই পর্যন্ত। ওর নাম 'কুচু' — কেন বা কে এই নাম দিয়েছিল, মনে নেই। নিতান্ত সাধারণ চেহারা, শরীরটা সাদা, ল্যাজ এবং কানের কাছে কালো-খয়েরি। আমাদের গয়লার সঙ্গে ভাব জমিয়ে রোজ খানিকটা ফ্রি দুধের বরাদ্দ জুটিয়েছে, তাছাড়া চেয়ে-চিন্তে চুরি-জোচ্চুরি করে খেয়ে-খেয়ে বেশ কেঁদো শরীর হয়েছে। এক-একদিন রাত্রে চার-পাঁচটা বিড়ালের সঙ্গে মহা হল্লা করে গুণ্ডামি করে — তখন মারধোর দিই। বড়-বড় ইঁদুর ধরে — কিন্তু ইঁদুর ধরা আমরা মোটেই পছন্দ করিনা। ইঁদুর মারলেই সেই বীরত্ব আমাদের দেখাবার জন্য রক্তমাখা থ্যাঁৎলানো ইঁদুর মুখে করে ঘরের মধ্যে, কখনও-বা বিছানায় নিয়ে আসে। তখন ধরে মার দিই, মাথা নিচু করে মার খায়। এ-সবকিছুর পরও যখন নিতান্ত অকারণে কোন-কোন সময় এসে পায়ে মাথা ঘষে, তখন মন্দ লাগেনা। কিন্তু আমি কুচুকে নিয়ে কিছু লিখতে বসিনি, ওর বাচ্চাগুলো সম্বন্ধে কিছু লিখতে চাই।

বছরে দু-তিনবার ওর বাচ্চা হয় এবং কোনবারই দু-তিনটের কম নয়। এতদিনে ওর শাবকসংখ্যার শতপূর্তি হয়েছে নিশ্চয়ই। বাচ্চাগুলো বাড়িতে রাখিনি — রাখলে বাড়ির অবস্থা কী হত কল্পনাও করা যায়না। আমরা কবে উচ্ছেদ হয়ে গিয়ে এ বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হত সুদৃঢ় বিড়াল-সমাজ! বাচ্চাগুলো কোথায়? কয়েকটির কথা জানি, বাকিগুলোর কথা জানতেও চাইনা।

যখন বাচ্চা হয়, তখন বিড়ালীর ক্রুদ্ধ এবং কাতর চোখ সত্যিকারের দেখার মতো। গর্ভিণী এখানে-সেখানে ঘোরে, ছটফট করে, নিরালা খোঁজে। বাচ্চা হবার পর বাঘিনীর মতো আগলে থাকে — তখন চোখ দেখলে হঠাৎ মনে হয় ওরও বুঝি একটা হৃদয় আছে, যা দুঃখিত কিংবা প্রীত কিংবা কৃতজ্ঞ হতে জানে।

বাচ্চাগুলি একটু বড় হলেই মায়ের টান কমে আসে। তারপর মা-টাই একদিন খাবারের ভাগ নিয়ে বাচ্চাদের সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে দেয়। আমাদের কুচুর

খানিকটা আত্মসম্মান জ্ঞান আছে। ওরই মুখের গ্রাস যখন কোন সন্তান এসে কেড়ে নেয়, তখন ও মারামারি শুরু করেনা বটে, কিন্তু গরর শব্দে অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করে। তখন আস্তে-আস্তে ওদের বিদায় করতে হয়। কখনো পুষবার জন্য নিয়ে যায় অনেকে — কেউ-কেউ সত্যিই পোষে — কেউ-কেউ আবার ফিরিয়ে দিয়ে যায়। তুলোর মতো নরম গা, সব বিড়াল-বাচ্চাকেই প্রথমে সুন্দর দেখায়। অনেকে শখ করে বাড়িতে নিয়ে বেড়াল পোষা শুরু করতে চায়। তারা বলে, 'ইস্, এমন সুন্দর বাচ্চাগুলোকে রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে মেরে ফেলবে? না, না, আমাকে দাও। আহা, অবলা জীব।'— কিন্তু প্রত্যেক সংসারেই দু-একজন থাকে যারা বিড়াল দুচোখে দেখতে পারেনা। তাছাড়া, বাচ্চারা লম্বা হয়ে, পুরুষ হলে — কদাকার ভারী মুখ নিয়ে যখন মাছ চুরি শুরু করে, তখন আর মায়া থাকেনা, তখন আবার আমাদের বাড়িতে ফেরৎ দিতে আসে অতিষ্ঠ হয়ে। সবগুলোকেই আমরা রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে আসি। মেথর কিংবা ঝিকে পয়সা কবুল করে ওদের বলি দূরের কোন পাড়ায় গিয়ে ছেড়ে আসতে। কখনো আমাকেই বাধ্য হয়ে ও দায়িত্ব নিতে হয়। মা ভাইবোনেরা প্রতিবার আপত্তি করে — কিন্তু আপত্তি শুনলে চলেনা। আমাদের কুচুকে আমরা হাজার চেষ্টা করেও প্রেম করা বন্ধ করতে পারিনা। এবং তিন-চারমাস পরপর ওর বাচ্চা হবেই। ওদের জন্য কোন জায়গা নেই, কিন্তু নিজের বাড়িকেও কেউ মার্জারশালা করতে চায়না। একটা মাটির ভাঁড়ে কিছুটা দুধ, কয়েক টুকরো পাঁউরুটি এবং থলিতে বাচ্চাগুলি নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়ি, যাবার পথে ওদের নানারকম গল্প বলি : ভয় কী তোদের, তোদের এমন দেশে নিয়ে যাচ্ছি, যেখানে কেউ দুধের কড়াইতে ঢাকা দেয়না, পথে-পথে সেখানে মাছ ছড়ানো। খুব ভালো থাকবি।

তারপর কোন মাঠের মধ্যে নামিয়ে — ভয় কী, কোন ভয় নেই, আমি আবার আসব — এইসব বলে বুঝিয়ে, পিছন ফিরে চোখ বুজে ছুটে পালিয়ে যাই। অনেকসময় এতদূরে নিয়ে যাই যে ফেরার সময় আমি নিজেই রাস্তা খুঁজে পাইনা।

আমার বন্ধু সত্যময় একটা সুন্দর দেখে বাচ্চা বাড়ি নিয়ে গেছে। এখন ওর নানান গুণপনা নিয়ে খুব উচ্ছ্বাস দেখায়। কিন্তু ওর যে কত বড় ভবিষ্যতের ক্ষতি হল এ কথা ভেবে আমি মাঝে-মাঝে অত্যন্ত দুঃখিত বোধ করি। কারণ, ওরটাও মাদী বেড়াল!

যখন চোখ ফোটেনা, তখন বাচ্চাগুলিকে ভারি নিষ্পাপ দেখায়। যখন একটু বড় হয়ে সারা বাড়িতে খেলে বেড়ায়, নীল কালির ফোঁটার মতো চোখ তুলে তাকায়, পরস্পর দাঙ্গা করে, অকারণে দৌড়োয় — তখন যাতে ওদের প্রতি কোনক্রমে মায়া না-পড়ে যায় তার চেষ্টা করি। যে কোন শিশুই সুন্দর — কারণ

তারা যুক্তিহীন।

বাচ্চা হবার পর কয়েকদিন ওদের মা অনেক গম্ভীর হয়ে যায়, চুরি-জোচ্চুরি করেনা! গরর-গরর করে ওদের সহবৎ শেখায়, টুঁটি ধরে এখানে-সেখানে নিরাপদে নিয়ে যায়, সমস্ত শরীর পরিচ্ছন্ন করে। তারপর অল্প কিছুদিন পরই ওদের দূর করে দিয়ে আসতে হয় — যখন ওদের দৌরাত্ম্য সহ্য করা যায়না। আমার কাকা অফিস যাবার জন্য পাটভাঙা জামাকাপড় পরে খেতে বসেছেন — এমনসময় উড়ন্ত কোন পোকা ধরবার জন্য ঝাঁপ দিয়ে একটা বাচ্চা সোজা এসে পড়ল মাছের ঝোলের বাটিতে। খাওয়া তো নষ্ট হলই, ঝোল ছিটকে জামাকাপড়ও গেল। এইরকম অসংখ্য। অথচ বাচ্চাটাকে মারলে, ও তার কারণই বুঝবেনা অসহায় সারল্যে তাকিয়ে থাকবে।

বিদায় করে দিলেও দু-একটা পথ চিনে ফিরে আসে। তখন আবার ফেলে আসতে হয়। আবার আসে, আবার ফেলতে হয়। সে এক অসহ্য অভিযান! ফিরে আসবার কী এক পরম দাবি ওরা বোধ করে — বুঝতে পারিনা। যেখানে ওদের ফেলে আসা হয় — কিছুদিন আমি সে-পথ দিয়ে হাঁটিনা — কোন দিন ভুল করে গিয়ে পড়লে মিঞাও-মিঞাও ডাক শুনে চমকে পালিয়ে যাই। কোন দিন আর দেখতে পাইনা — কোন বিড়ালহীন গৃহে দৈবাৎ ওরা স্থান পেয়েছে এই ভেবে খুশি হবার চেষ্টা করি। কোন দিন হয়তো দেখি বাচ্চা ছেলেরা ল্যাজে দড়ি বেঁধে টানাটানি করে খেলছে। আমি ধমকে ছাড়িয়ে দিই — তাও খুব নৈর্ব্যক্তিকভাবে। বুঝতে দিইনা, আমারই বাড়ির বাচ্চা। তাহলে যদি ফিরিয়ে দিতে আসে! ছেলেদের ধমক দেবার সময় গলায় জোর পাইনা, কারণ ছেলেদের হাত থেকে বাঁচিয়ে — ওদের কোন নিরাপদ জায়গায় রাখব তা তো জানিনা।

বাচ্চা হারাবার পর মা-বিড়ালী কয়েকদিন কী কাতরভাবে কেঁদে-কেঁদে ঘোরে — সেই কথা মনে পড়ে। কিন্তু কী করব, আমার কিছু করবার নেই।

এক-একদিন দেখি, রাস্তার মাঝখানে একটা বেড়ালবাচ্চা গাড়ি চাপা পড়ে চ্যাপ্টা হয়ে মরে পড়ে আছে। সেই সুন্দর কচি শরীরটা এখন কী ভয়ংকর। একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়াই। আমার ছোট বোন এই বাচ্চাটাকে কত ভালোবাসত, মনে পড়ে। রাত্তিরে আমার পায়ে কত খুনসুটি করেছে এই বাচ্চাটা, আমার মা এক-একদিন নিজে না-খেয়ে সম্পূর্ণ দুধের বাটিটা ঠেলে দিয়েছেন এদের দিকে। এ কথা ভেবে তৎক্ষণাৎ সরে পড়ি।

তারপর যে রাস্তায় যাই, শুনি মিউ-মিউ। তাকিয়ে দেখি, আমাদেব বাচ্চা কিনা। না। অন্য কোথাও গেলেও সেই মিউ-মিউ। কলকাতার গলিতে-গলিতে। আমাদের বাড়ির বাচ্চা কিংবা তার বাচ্চার বাচ্চা কিংবা কয়েক হাজার অন্য বাচ্চা। হয় ট্রাম লাইনের পাশে থ্যাৎলানো অথবা অসহায়ভাবে ঘুরছে। বৃষ্টির সময় দেখি

ভিজে জড়সড় হয়ে এক কোণে বসে কাঁপছে, কাকগুলো জ্যান্ত শরীরেই ঠোক্‌রাতে চাইছে। আমাকে পালিয়ে যেতে হয় — কারণ আমার কিছু করবার নেই। আমি ওদের নিরাপদ আশ্রয় দিতে পারবনা।

যুদ্ধের সময় বোমার শব্দে পাগল হয়ে লন্ডনে বারো হাজার বিড়াল পথে-পথে ঘুরেছে -- কাগজে এ খবর পড়েছিলাম। কলকাতার পথে-পথে অসংখ্য মার্জারশিশুর ডাক আমাকে না পাগল করে দেয়!

৯

পিছন থেকে কাঁধে টোকা মারতেই লোকটি চমকে উঠল। সঙ্গের মেমসাহেবটি বলল, 'টেক কেয়ার ডার্লিং।'

লোকটি রেলিংয়ের ওপর বেশ কায়দায় ব্যালেন্স করে দাঁড়িয়ে ক্যামেরা বাগিয়ে ধরেছিল। দূরে এক বুড়ি শুয়ে আছে ফুটপাতে, বোঝা গেল লোকটির ক্যামেরার একচক্ষু ঐ-দিকেই। বললাম, 'ভিখিরির ছবি তুলছ বুঝি? যাঃ — এটা কি একটা সাবজেক্ট হল? — চলো, তোমায় ভালো-ভালো ভিখিরির জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি।'

লোকটি তাড়াতাড়ি রেলিং থেকে নেমে দাঁড়িয়ে ক্যামেরাটা বন্ধ করবার চেষ্টা করল। আমি বললাম, 'কী, আর ছবি তুলবে না? আমি তোমাকে ভালো জায়গায় নিয়ে যাব।'

মেমসাহেবটি বলল, ''আর য়ু সীরিয়াস?'

একগাল হেসে বললাম, 'তা না তো কী? তোমরা সাহেব-মেমরা এসে কী ছবি তুলতে চাও, আমি জানিনা? তোমরা নিজেরা কি সে-সব খুঁজে পাবে? চলো, আমি আসল-আসল জায়গায় নিয়ে যাব। কী একটা বুড়ির ছবি তুলছ? — এ কি আর কলকাতার ভিখিরির ছবি হল? ফিরে গেলে তোমার দেশের লোক বিশ্বাস করবে? মনে করবে ফেক, গট-আপ। সত্যিই যে ভারতবর্ষে এসেছিলে, তার প্রমাণ দিতে হবে তো! আমি তোমাকে এমন জায়গায় নিয়ে যাব —'

— তুমি প্রথমটা ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলে। সাহেবটি বলল, 'আমাদের এমব্যাসির লোক বলে দিয়েছে — ভিখিরি-টিখিরির ছবি তুললে — অনেকসময় এখানকার লোক ক্ষেপে যায়। ক্যামেরা কেড়ে নেয়, অনেকসময় —'

— তাহলে তো প্রাণ হাতে করে ছবি তুলছ, বলো! তা ক্যামেরা-ট্যামেরা কেড়ে নেয় অনেকসময় ঠিকই। মারধোরও করে। তাছাড়া সাধু কিংবা যোগীরা

অভিশাপ দিয়ে ভস্ম করে দিতে পারে। সাপুড়ে গায়ে সাপ ছুড়ে দিতে পারে.—

— যাঃ, ওসব নিশ্চয়ই গল্প।

— মোটেইনা। সাপুড়ে আর যোগীরা কলকাতায় ঘুরে বেড়ায় এটা গল্প? মোটেইনা — বিশ্বাস করো! আজ হয়তো এক্ষুনি দেখতে পাবনা। দু-একদিন সময় পেলে তোমায় নিশ্চয়ই ক্যামেরার ফুটো দিয়ে দেখিয়ে দিতাম — প্রকাশ্য রাস্তায় সাপ খেলানো হচ্ছে। ভালুক-নাচওলা দুপুরের রোদে ভালুকের গায়ে হেলান দিয়ে ঘুমুচ্ছে গাড়িবারান্দার নিচে। বাঁদর নাচও অহরহ। গঙ্গার ঘাটে অসংখ্য সাধু আর যোগী। যাই হোক, তোমাকে এক্ষুনি যা দেখাতে পারব — তাও কম নয়। আমি সঙ্গে আছি — ভয় নেই। তুমি টেলিভিশন না সিনেমার—

— ওসব কিচ্ছুনা। আমি শুধু নিজের কালেকশনের জন্যে। জানো তো ছবি তোলার বিষয় নতুন না-হলে ভালো লাগেনা। কলকাতার এইসব বাড়ি ঘর বা অন্য কিছু নতুন কী আর। বরং এইরকম রাস্তায় লোক শুয়ে থাকবার দৃশ্যই আমাদের কাছে নতুন।

— নিশ্চয়ই। এসো আমার সঙ্গে। গাড়িতে হবেনা, হেঁটে যেতে হবে। এসো, মেম, সাহেব।

লোকটি বৃষস্কন্ধ, শালভুজ, ফরসা দৈত্য একটি। কোন দেশের জিজ্ঞেস করিনি। সব সাহেবই আমার কাছে সমান। মেমটি এমন রংচঙে পোশাক পরেছে — যেন একটা হীরামন পাখি। এমন আলতোভাবে হাঁটছে যেন শরীরটা হাল্কা তুলোর মতো। স্বাস্থ্য আর রূপে ঝলমল করছে দুজন। সেই সঙ্গে ঐশ্বর্য। এমন চমৎকার সংসর্গে কিছুক্ষণ কাটালেও মনটা ভালো লাগে।

আমি প্রথমেই ওদের নিয়ে গেলাম মৌলালির মোড়ে। সেখানে একটি কুষ্ঠরোগী বসে, জানতাম। কুষ্ঠরোগী হিসেবে একেবারে নিখুঁত, শরীরের অধিকাংশ জায়গাতেই ব্যান্ডেজ জড়ানো, শুধু একটা হাত আর মুখটুকু খোলা। সেখানে দগদগ করছে ঘা। একটা কাঠের বাক্সে বসে থাকে — আর একটি বাচ্চা ছেলে সেটা টানতে-টানতে ভিক্ষে চায়। মেমটি স্বামীর বাহু চেপে ধরে অস্ফুট গলায় বলল 'ও মাই — নো, নো!'

আমি বললাম, 'কীরকম সাবজেক্টটা? ভালোনা? আগে এরকম আর পেয়েছ?' লোকটি বিনা শব্দে পরপর দুটো স্ন্যাপ নিল। তারপর সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'ইনক্রেডিবল।'

আমি বললাম, 'চলো কাছেই আরেকটা জায়গায়! সেখানে পাবে, যাকে তোমাদের ইংরেজিতে বলে, 'চোখের ভোজ'।' শিয়ালদার দিকে এগোলাম। যাবার পথেই অবশ্য ফাউ হিসেবে আরেকটি উত্তম বিষয় পাওয়া গেল। বউবাজারের

মোড়ের কাছে সেই খোঁড়া ষাঁড়টি, প্রায়ই যাকে দেখি, পিছনের পা টেনে চলে, ভারি শান্ত মুখখানি, অনেকটা — বাবুর মতো। ষণ্ড প্রভু তখন যে প্রাকৃতিক কাজটি প্রকাশ্য রাস্তায় করছিলেন, তার জন্য সবচেয়ে ভদ্র শব্দ বোধ হয়, ডিহাইড্রেটিং। ক্যামেরা গোটাবার পর সাহেবটিকে জানালাম, এটা সে সত্যিকারের একটা দুর্লভ দৃশ্য পেয়েছে। কারণ, একসময় যদিও কলকাতার পথঘাট ছিল ষণ্ডদের কৃপার অধীন, কিন্তু এখন অনেক সরিয়ে ফেলা হয়েছে, পুণ্যার্থীদের এখন অনেক খুঁজতে হয় ওদের দর্শন পাবার জন্য।

শিয়ালদাতে মনের মতো দৃশ্যই পাওয়া গেল। বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলো কোনক্রমে দৈবাৎ প্যান্ট-জামা পরে ফেলেনি। যথারীতি উলঙ্গ হয়েই ছোটাছুটি করছিল। সাহেব-মেম দেখে সক্কলে এসে ভিক্ষের জন্য ছেঁকে ধরল। দুপুরের সময় খুপরি ঘরগুলোর সামনে উনুন জ্বালিয়ে ছাইভস্ম রান্না শুরু হয়ে গেছে, কঙ্কালসার বুড়ো-বুড়িরা গড়াগড়ি দিচ্ছে মাটিতে, যুবতী মেয়ে নেই একটিও। চতুর্দিকে একটা বিশ্রী ভাপসা গন্ধ। পাশ দিয়ে সুবেশ ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলারা ট্রেন ধরতে বা ট্রেন থেকে নেমে সবেগে ছুটে যাচ্ছেন। সব মিলিয়ে একটা অত্যন্ত নিস্পৃহ আবহাওয়ার জন্যই দৃশ্যটি অসাধারণ। বললাম, 'তোমার মুভি ক্যামেরা আনা উচিত ছিল!'

— এরা কারা?

— নাম শোননি? পূর্ব বাংলার রিফিউজি। এ আর কটা দেখছ — এ যাবৎ সব মিলিয়ে এসেছে পঁচাত্তর লক্ষ অর্থাৎ সাড়ে সাত মিলিয়ান। তুলে নাও ছবি।

— এরা জন্তুর মতো এরকমভাবে থাকে! এরাও তো আফটার অল, মানুষ! — এদের থাকার ব্যবস্থা করা যায়না?

— এই তো চমৎকার ব্যবস্থা। তুমি কি ভাবছ, এ-দেশের আদি বাসিন্দারা সবাই এর চেয়ে ভালো আছে? এখনও তো বস্তিগুলো দেখনি। তাও দেখাব।

রাস্তায় বেরিয়ে কিছুদূর হাঁটবার পর লোকটি নিজেই আমাকে একটা দৃশ্য দেখালো। একটা বাড়ির সামনে বিরাট লাইন পড়েছে। ঠেলাঠেলি, হট্টগোল, পাশে লাঠি হাতে সেপাই। লোকটি বলল, 'ও কিসের কিউ? বাড়িটা দেখে তো সিনেমা-থিয়েটার বলে মনে হয়না? তবে কি কোন মিউজিয়াম?' আমি সেদিকে তাকিয়ে বললাম, 'না, তবে ওটার ছবি তুলে লাভ নেই।'

— কেন? — লোকটি ভাবল, আমি বুঝি কোন কিছু গোপন করছি।

বললাম, 'ওরকম লম্বা লাইন তো তোমাদের দেশেও পড়ে শুনেছি সিনেমা-থিয়েটারে। সুতরাং লাইনের ছবি আর নতুন কী? আসল জিনিশটা তো আর বোঝাতে পারবনা! ওখানে রেশন কার্ড দেওয়া হচ্ছে।'

— তা দিয়ে কী হবে?

— ঐ-কার্ড দেখিয়ে খাবার পাওয়া যাবে।

— ইউ মীন, ফ্রি? মেমসাহেব জিজ্ঞেস করলেন।

ওদের মুর্খতা দেখে হাসি চেপে রাখা কষ্ট। অথচ মুখের ওপর হো-হো করে হেসে ওঠা ভদ্রতা নয়। তাই বললাম, 'কেন, তোমাদের দেশে কি খাবারদাবার বিনা পয়সায় পাওয়া যায় নাকি? কী এমন দেশ থেকে এসেছ হে?'

— না না না। তবে পয়সা দিয়ে খাবার কেনার জন্য অতখানি লম্বা লাইন? সেটা দেখেই একটু অবাক লাগছে। কোন বিশেষ খাবার-টাবার নাকি? সী ফুড, অর...

— নাঃ! স্রেফ চাল গম। যাক, ও নিয়ে সময় নষ্ট কোরোনা। দৃশ্য হিশেবে এটাতে কোন মজা নেই।

মেমসাহেবকে বাইরে দাঁড় করিয়ে আমি আর সাহেবটি চট করে একটা বস্তির মধ্যে একপাক ঘুরে এলাম। সে-ও খুব চটপট ছবি তুলে এনেছে, বেশ পাকা হাত। সহস্র সচকিত চোখকে প্রশ্রয় দিয়ে আমরা বেশিক্ষণ দাঁড়াতে চাইনি। অবশ্য, খুব সহজে কাজটা মেটেনি। বস্তির মধ্যে কাঁচা নর্দমা উপছে উঠে গলিটা ছপছপে হয়ে উঠেছিল কাদা, এঁটো-কাঁটা, আরও কয়েকটি দুরুচ্চার্য ময়লায়। আমি চটিজোড়া খুলে হাতে নিয়েছিলাম, বাইরে এসে চাপাকলে পা ধুয়ে নিলাম। কিন্তু বিদেশিটির জুতোজোড়া কাদায় মাখামাখি। আমি সেজন্য দুঃখ প্রকাশ করলাম। বললাম, 'তুমি বলছিলে তুমি ইতিহাসের ছাত্র ছিলে। তাহলে, নিশ্চয়ই জান, ভারতবর্ষ কতবড় সভ্য দেশ — পাঁচ হাজার বছর আগেও আমাদের মহেঞ্জোদারো-হরপ্পার মানুষরা নর্দমা ব্যবহার করতে জানত। এবং মজা কী জান — পাঁচ হাজার বছর পরেও আমাদের নর্দমাগুলো মহেঞ্জোদারো-হরপ্পার মতোই আছে অবিকল। ঐ যে দেখলে গোরুর গাড়ির জন্য ট্র্যাফিক জ্যাম হয়ে গেছে। কিন্তু এ-কথা কি জান — আমাদের দেশের লোক যখন প্রথম গোরু দিয়ে গাড়ি টানতে শেখে — তখন তোমরা কোথায় ছিলে? তোমরা তখন গুহায় থাকতে কিংবা গাছের ডালে বাঁদর হয়ে ঝুলতে! কিন্তু আমরা এখনও গোরুর গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছি। সেই ট্র্যাডিশান সমানে চলেছে!'

বিদেশিটি বলল, 'ওয়েল নীল, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু, আজকের পক্ষে যথেষ্ট হয়েছে। আমার স্ত্রী অসুস্থ বোধ করছেন। এবার হোটেলে ফিরব ভাবছি।' মেমসাহেবটি একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। সত্যি এতখানি হাঁটাহাঁটি বোধহয় জীবনে করেনি। সোনার অঙ্গে ক্লান্তির ছাপ পড়েছে। টসটস করছে চোখদুটো। আমার হাত ধরে বেশ আন্তরিকভাবে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'সত্যি, তুমি

নিজের কাজ নষ্ট করে আমাদের সঙ্গ দিলে। অনেক ধন্যবাদ। এবার যাই।'

— সেকি ! এর মধ্যেই চলে যাবে ? আমি তো আরও কত জায়গায় নিয়ে যাব ভেবেছিলাম। দেখাতাম শ্মশানে মড়া পোড়ানো, সাধু-সন্ন্যাসী — খাঁটি 'ইয়োগী', রেড ল্যাম্প ডিস্ট্রিক্ট — হাজার হাজার মেয়ে যেখানে নিজেদের দেহ পণ্য করছে, আরও দেখাতাম রাত্তিরবেলা রাস্তায় সার বেঁধে কী করে লোকেরা ঘুমোয় — অর্থাৎ যা তোমরা এ দেশ সম্বন্ধে শুনে আস, সত্যি-সত্যি সেই সব জিনিশ। আরও অনেক বিচিত্র জিনিশ দেখাতাম — অফিস-ফেরত ট্রাম-বাস, কলকাতার পাঁচ মাইলের মধ্যে মশার ঝাঁক ...। দুঃখ রয়ে গেল, তোমাদের সাপ-খেলা বা ভালুক-নাচ দেখাতে পারলামনা। কিন্তু সত্যিই ওসব এখনও আছে, বিশ্বাস করো।

মহিলাটি খুব কোমল গলায় আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি তোমার দেশের এ-সব খারাপ জিনিশ আমাদের দেখাতে চাইছ কেন ?'

— খারাপ ভালো জানিনা। আমাদের কলকাতায় বিখ্যাত ঐতিহাসিক কোন স্মৃতিচিহ্ন নেই, সমুদ্র পাড় নেই— ঠিক দেখার জিনিশ কিছু নেই। এইসবগুলোই আসলে দেখার। এ দেশে আয়রন কার্টেন নেই — তোমরাও যা খুশি দেখতে পারো — শুধু বিদেশে যাতে বেশি ঘোরাঘুরি করতে না হয়, তাই আমি সাহায্য করছিলাম।

— কিন্তু এ-সব ছবি দেখালে বিদেশে তোমাদের দেশের দুর্নাম হবে, মনে করনা ?

— মোটেইনা। এ দেশের যা সত্যিকারের চেহারা, তা লুকিয়ে লাভ কী ? ভারতবর্ষ বলতে কি শুধু তাজমহল আর অজন্তা-ইলোরা আর কোনারক-খাজুরাহো ? এ দেশে অসংখ্য ভিখিরি আর উপোসী মানুষ আছে, তা কি গোপন করার কথা ? আজ পৃথিবীর প্রায় সব দেশ থেকে ভারতবর্ষ খাবার নিচ্ছে দাতব্য হিসেবে, টাকা ধার করছে — এ তো জানা কথা। সুতরাং দেশের আসল চেহারা লুকিয়ে লাভ কী ?

— ওঃ আচ্ছা, মাফ করো আমাদের। এ-আলোচনায় যেতে চাইনা। আজ যাই। আমাদের বন্ধুত্বের চিহ্ন হিসেবে তোমাকে একটু কিছু উপহার দিতে পারি ?

— হ্যাঁ, তোমাদের দুজনের একটা করে ছবি পাঠিয়ে দিয়ো। আমি একটা রূপকথার বই লিখছি বাচ্চাদের জন্য। তোমাদের ছবি দুটো ছেপে দেব ওতে, রূপকথার দেশের মানুষ হিশেবে।

ওরা দুজনেই সমস্বরে বলে উঠল, 'নো, নো, ইউ আর কিডিং। তুমি বোধহয় গোড়া থেকেই ঠাট্টা করছ আমাদের সঙ্গে !'

১০

একঠো কালীঘাট।

আমি ভেবেছিলাম শুধু আমিই বুঝি মেয়েটিকে লক্ষ করছি। তা নয়, মেয়েটি কথাটা বলামাত্রই পাঁচ-সাতজন লোক আঁৎকে উঠে তৎক্ষণাৎ সমস্বরে বলে উঠল, 'কালীঘাট, কালীঘাট এদিকে কোথায় ?' এমনকি মদ্রদেশবাসী দাড়িওয়ালা ড্রাইভার পর্যন্ত মুখ ঘুরিয়ে মেয়েটিকে দেখল।

ব্যারাকপুরের বাস, চিড়িয়ার মোড় পেরিয়ে ছুটছে। সকাল সাড়ে আটটা।

মেয়েটি বাঁ হাতে একটা চকচকে সিকি উঁচু করে ধরেছিল, আস্তে-আস্তে সেটা নামিয়ে কেমন অভূতপূর্ব চোখে তাকাল। জানলা দিয়ে একটা রোদ্দুরের তীর তার বুক ভেদ করে ওদিকে পর্যন্ত পৌঁছিয়েছে।

জানলার ওপর কনুই ভর দিয়ে হেলে বসেছিল মেয়েটি, বাঁ পা-টা একটু উঁচু করে তুলে রেখেছে। আমি অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে দেখছিলাম। একমাথা সোনাঝুরি লতার মতো হিজিবিজি ময়লা চুল, আঙুল দিয়ে মাঝে-মাঝে পিছনে টেনে সরিয়ে দিচ্ছিল। একপর্দা ধুলো সত্ত্বেও বোঝা যায় মেয়েটির গায়ের রঙ সদ্য রংধরা আপেলের মতো, বয়স চোদ্দ থেকে একুশের মধ্যে নিশ্চয়ই। চোখের মণিদুটি কটা, বনবিড়ালের মতো ভয়ংকর সরল। ঘাগরা আর কাঁচুলি পরে আছে, কাঁচুলির ঠিক মধ্যে দিয়ে একটি রুপালি স্ট্র্যাপ দেওয়া — মাঝে-মাঝে রোদ্দুরে সেটা ঝলসে উঠছে।

নিশ্চয়ই বেদেনী, অথবা যাযাবরী, আমি ভেবেছিলাম — অর্থাৎ ভ্রাম্যমাণ ভিখারিনী। বহু গল্পে পড়েছি এদের কথা, চলচ্চিত্রে দেখেছি, কলকাতাতেও কোথাও-কোথাও, কার্জন পার্কের পাশে, হাওড়া ময়দানে কখনো চোখে পড়েছে, দলবলশুদ্ধ, ছাগল-খচ্চর মোটঘাট সমেত। কিন্তু এমন একলা, এরকম বাসে, এই সুকুমার সকালবেলায় একটি বেদেনী দেখতে পেয়ে অত্যন্ত আকৃষ্ট বোধ করেছিলাম। মফঃস্বলমুখী বাসে বিবর্ণ এবং পিষ্ট চেহারার মানুষের ভিড়ে এই মেয়েটিকে মনে হল আকস্মিক প্রাপ্তির মতো। বেদেনী না-হলেও আমি তাকিয়ে থাকতাম। কোন সুন্দরী মেয়ের দিকে খোলাখুলি তাকাতে আমার লজ্জা করেনা।

...বাস রোককে, এখানে নামিয়ে দাও, উল্টোদিককা বাসমে উঠো ... কিছু লোক চেঁচিয়ে উঠল। ব্যারাকপুরের দিকে কালীঘাট কোথায় ! বাস থেমে গেল, মেয়েটি একটি বিচিত্র ভ্রূভঙ্গি করে সতেজ পায়ে নেমে গেল। যেন কালীঘাট পৌঁছনো সম্বন্ধে তার কোন দ্বিধা নেই।

আমি ছটফট করছিলাম। যেন আমার বুক থেকে কোন এক অস্পষ্ট বক্তব্য প্রকাশ করবার জন্য ব্যাকুলতা বোধ করছিলাম আমি। জানালা দিয়ে অনেকখানি

মুখ বাড়িয়ে ছিলাম, তারপর বাস একটু চলতে শুরু করতেই আমি যেন আমার কোন বন্ধুকে দূরে দেখতে পেয়েছি, এই ভঙ্গি করে তৎক্ষণাৎ বাস থেকে ছিটকে নেমে পড়লাম। আমার পরিধানে ভদ্র পোশাক, দাড়ি কামানো চকচকে মুখ, কোন গম্ভীর কার্যে ব্যারাকপুর যাচ্ছিলাম। কিন্তু এই অস্বাভাবিক মেয়েটি কেন এই অসময়ে, এইখানে বাসে উঠেছিল এবং কোনদিনও সে কালীঘাটে পৌঁছুবে কিনা — এ কথা জানবার জন্য আন্তরিক ইচ্ছে বোধ করলাম। মনে হল, এ কথা জানতে না-পারলে, এই কৌতূহলেব অসুখে আমাকে বহুদিন ভুগতে হবে।

চকচকে কালো পিচ ঢালা ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের ওপব মেয়েটি দাঁড়িয়ে ছিল। রোদ্দুর তার দেহের চেয়েও ছোট ছায়া ফেলেছে। দাঁড়িযে থাকতে-থাকতে মেয়েটি হঠাৎ বাঁ পায়েব গোড়ালিতে ভর দিযে এক পাক ঘুরে গেল — তারপর অকারণে রাস্তাব অন্যপারে চলে গেল এক ছুটে।

একি, আবার ও ব্যারাকপুরের বাসে উঠতে চায় নাকি ? আমি একটু দূবে অন্যমনস্কভাবে দাঁড়িয়েছিলাম, মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে পারিনি। মনে হচ্ছিল, রাস্তার প্রত্যেকটি লোক ভেবে নিয়েছে যে আমি মেয়েটির জন্য দাঁড়িয়ে আছি, এখন রাস্তার ওপারে মেয়েটিব কাছে আর যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। দূরে একটা বাস আসছে। আমি চোরা চোখে চেয়ে দেখলাম, নর্দমাব ধারেব একটি বনতুলসীর ফুলহীন ডাটা ভাঙবাব চেষ্টা করছে সে। হঠাৎ চলন্ত গাড়ির সামনে দিয়েই প্রায় ছুটে এপারে এল, এবং সদ্য-থামা বাসে উঠে পড়ল। অন্য দরজা দিয়ে উঠলাম আমি। ওর দিকে সোজা মুখ কবে বসলাম।

— কাহে নেই কালীঘাট যায়গা ?

এবার কন্ডাক্টারের প্রত্যাখ্যানের বিরুদ্ধে সে দৃপ্ত ভঙ্গিতে রুখে উঠল। যেন রাস্তায় দুদিকের কোন দিকের বাসই কালীঘাট যাবেনা — এ-ত্রুটি সে সহ্য করবে-না। সহৃদয় ভদ্রমহোদয়গণ এবং কন্ডাক্টার তাকে বুঝিযে দিলে যে শ্যামবাজাব গিয়ে বাস বদল করতে হবে। এটুকু বোঝাবার জন্য তাদের অনেক বাক্যব্যয় করতে হল, যতক্ষণ-না বাস শ্যামবাজাবে এসে থামল।

তখন শ্যামবাজার অঞ্চল মানুষের ভিড়ে লিবিয়ার জঙ্গলের মতো। সেখানে মেয়েটিকে বড় সামান্য এবং অসহায় মনে হয়। প্রথম দর্শনেই আমি মেয়েটির প্রেমে পড়ে যাইনি। মেয়েটিকে কেন্দ্র করে কোন রোম্যান্টিক কল্পনা আসেনি। কেন আমি মেয়েটির সঙ্গে-সঙ্গে এসেছি নিজেও জানিনা। শুধু ভেতরে-ভেতরে একটা কষ্ট হচ্ছে, মেয়েটি যেন ভুল জায়গায় না-পৌঁছয়।

আমার ইচ্ছে হয়েছিল, মেয়েটিকে যত্ন করে কোন কালীঘাটের বাসে তুলে দিই। কিন্তু তখন উল্টে আমার এই ভয় হচ্ছিল যে, যদি সে আমায় চিনে ফেলে

কোন কথা বলে, কোন মিনতি কিংবা আদেশ করে, কিংবা চেঁচিয়ে উঠে আমাকে গালাগালি দেয়, তবে আমার ভদ্রপদবী বিচলিত হবে, এক হাজার লোক আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে হাসবে। আমি চোরের মতো মেয়েটির পিছন-পিছন আসতে লাগলাম নিঃশব্দে।

ততক্ষণে অফিস যাত্রীদের ভিড় শুরু হয়েছে। হৌসের বাবুরা পানের ডিবে হাতে করে ধীর-স্থিরভাবে প্রতীক্ষা করছে গাড়ির। জামার কলার চকচকে ইস্ত্রি করা, সকলেরই ভিজে মাথায় চিরুনির চিহ্ন আছে। কেরানিরা জামার হাতায় বোতাম লাগাতে ভুলে গিয়ে পরস্পর অনেক কথা বলাবলি করছে। শোভন পোশাকে সজ্জিত হয়ে মেয়েরা ধীর-স্থিরভাবে একটু বাদেই প্রচণ্ড ভিড়ের হুল্লোড় ছিনিমিনি খেলার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে। ট্রাম-বাসের পাদানিতে পা রাখবার জন্য পরম যত্নে শাড়িটা একটু উঁচু করা।

এই প্রসঙ্গে বেদেনী মেয়েটির উপস্থিতি বিরল ব্যতিক্রমের মতো। ফুটপাতের রেলিঙে পা তুলে সে ঘাগরার হাঁটু পর্যন্ত তুলে পরম অভিনিবেশ সহকারে পা চুলকোচ্ছে এবং কোন ব্যথার জায়গায় হাত বুলোচ্ছে। তারপর সে মাথা থেকে একটা উকুন বার করে দুই বুড়ো আঙুলের নখে টিপে শব্দ করে মেরে — নাকের কাছে হাত এনে রক্তের গন্ধ শুঁকল। তারপর পিছন ফিরে হঠাৎ তীব্র চোখে আমার দিকে চেয়ে একটা বাসে উঠে পড়ল।

আমি শিউরে উঠলাম, এবং বলবার চেষ্টা করলাম, ও বাস নয়, ও বাস কালীঘাট যাবে না, হাওড়া যাবে। বলা হলনা। মাথা দিয়ে ঢুঁ-মেরে ভিড় সরিয়ে নির্বিকারভাবে মেয়েটা ভিতরে ঢুকে গেল। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

আমাকে এখন জরুরি গম্ভীর কাজে ব্যারাকপুর যেতে হবে। সারাদিন এক ছাঁচের এক মাপের মানুষের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে হবে। মেয়েটা শেষ পর্যন্ত কোথায় যাবে, কোনদিন কালীঘাট পৌঁছবে কিনা, সকালবেলা কোথা থেকে ও এসেছিল — এই না-জানা রহস্যগুলি আমাকে যাবার পথের একা বাসের জানালার চারপাশের অন্যসব দৃশ্যগুলি সম্পর্কে অন্ধ করে রাখবে নাকি? এই বি-পথে যাওয়া মেয়েটির ছবি আমাকে আরও কতদিন জ্বালাবে কে জানে!

১১

আমাদের দুজন বন্ধু এম. এ. পাশ করে এখনও বেকার। প্রায়ই দুপুরের দিকে আমাদের আপিস-টাপিসে এসে বলে, 'আহা, তুমি একা-একা টিফিন খাও, তাই

সঙ্গ দিতে এলাম।' বন্ধু দুজনেই বহু গুণের আকর, তবুও তাদের চাকরি না-পাওয়ার একগুঁয়েমিতে আমাদের অবাক লাগে। ওদের আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, ডিগ্রি যখন আছে, তখন কলেজ বা স্কুলে শিক্ষকতার চাকুরি কেন অন্তত খুঁজে নেয় না। কলেজে না-হলেও, স্কুলের চাকরি এখনও তো খুব দুর্লভ নয়। দুই বন্ধুর উত্তর দুরকম।

প্রথম বন্ধুর বাবা, ঠাকুর্দা প্রভৃতি সকলেই শিক্ষক ছিলেন। কয়েক বছর আগে ওর বাবা রিটায়ার করবার আগেই মারা গেছেন। আমরা শ্রাদ্ধের সময় চাঁদা দিয়েছিলাম। বন্ধুটি বলল, 'কী করব ভাই, আমার তো ইচ্ছে আছে, কিন্তু মাতৃআজ্ঞা !'

— সেকি !

— মা প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছেন যে, একেবারে খেতে না-পেলে বরং দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ির সামনে বসে লোকের জুতো রেখে পয়সা নেব, কিন্তু মাস্টারি করতে পারবনা। আমাদের বংশে আর কেউ মাস্টারি নিলেই মায়ের অভিশাপ লাগবে !

দ্বিতীয় বন্ধুর উত্তরটি একটু ঘোরালো। বলল, 'ইস্কুল-কলেজের জীবনে কোন একজন শিক্ষকেরও নাম মনে করতে পারিস, যিনি যথার্থ শ্রদ্ধেয় ?' আমরা যখন ঠিক কোন নামটি বলব ভেবে ভুরু চুলকোচ্ছি, তখন সে বলল, 'তোরা হয়তো পারিস, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, আমি পারিনা। প্রাচীনকাল থেকে আমাদের দেশে কত মহৎ শিক্ষকের কথা শুনেছি, কিন্তু তাঁদের ক্ষীণছায়াও আমি মাইরি দেখিনি আমার গোটা ছাত্রজীবনের কোন শিক্ষকের মধ্যে। সকলের বিরুদ্ধেই আমার অভিমান আছে। কেউই আমাকে বই-পড়ানো ছাড়া একটুও শিক্ষা দেননি। এমন কারুকে দেখিনি যাঁর জীবন আমার কাছে মনে হত অনুকরণের যোগ্য। রচনা লিখতে দেবার নাম করে ক্লাসে ঘুমোনো, ছাত্রদের ছলে-বলে-কৌশলে নিজের কোচিং-এ ভর্তি করার চেষ্টা, নিজের লেখা নোটবই গছানো, শক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে 'বখাটে' হয়ে গেছি অপবাদ পাওয়া' — এইসব। দেবতুল্য চেহারা ও কণ্ঠস্বরের এক মাস্টারমশাই ছিলেন আমাদের স্কুলে, তিনিও — আমি অঙ্কে ফেল করেছিলাম টেস্টে, কিন্তু তাঁর জন্য ভাড়া-বাড়ি জোগাড় করে দেওয়ায় — আমাকে ষাট নম্বর দিয়ে পাশ করিয়ে দিয়েছিলেন। আমিও ওঁদের মতোই হয়েছি। আমি খুব ভালো কেরানি বা অফিসার হতে পারি, এমনকি ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ারও হতে পারতাম, কিন্তু কারুকে কিছু শেখাবার কোন সম্বল নেই। আমি আদর্শবাদী নই, জীবনে হয়তো অনেক অন্যায় করতে হবে — কিন্তু ছোট ছেলেদের ঠকাতে চাই না। বাচ্চাদের চোখকে আমি ভগবানের চেয়ে বেশি ভয় করি।

এসব সত্ত্বেও আমাদের পরিচিত বহু শিক্ষক আছেন। অনেকে নিশ্চিত সুশিক্ষক। অপর এক বন্ধু, আগাগোড়া সমস্ত পরীক্ষায় ফার্স্ট হতেন, তিনি অনায়াসে আই. এ. এস. হবার লোভ সংবরণ করে স্বেচ্ছায় শিক্ষক হয়েছেন। সুতরাং আমরা উনিশে জানুয়ারি শিক্ষকদের নীরব মিছিল দেখতে গিয়েছিলাম।

কথা রেখেছিলেন শিক্ষকরা। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শান্ত শোভাযাত্রা। স্লোগান নেই, জিগীর নেই। অর্থাৎ ছাত্রদের মিছিল থেকে নিজেদের তাঁরা আলাদা রাখতে পেরেছিলেন। অনেক শিক্ষক তো কিছুদিন আগেই ছাত্র ছিলেন কিংবা এখনো ছাত্র, (প্রাইভেটে অনার্স বা বি. টি. ক্লাস বা রাত্তিরে এম.এ. পড়া) কিন্তু ছাত্রজীবনের অভ্যেস এখানে কাজে লাগেনি। অর্থাৎ তাঁদের নীরব মুখের ভাষা থেকে বুঝতে পারা যাবে তাঁদের দাবি ও অভিযোগ। অবশ্য মুখ দেখে বোঝা যায়না। কারণ সব মিছিলেই যা হয়, সব সমস্যা মুছে গিয়ে সেখানে একমাত্র সমস্যা হয় লাইন ম্যানেজ করা। দুজন-দুজন করে যান ... ওকি ওখানটায় ফাঁক পড়ে গেল যে ... ভিতর দিয়ে লোক যাচ্ছে কেন ... দৌড়ে মেক-আপ করুন ... ইত্যাদি। সুতরাং পোস্টার ও ফেস্টুন ছিল।

অফিসফেরৎ লোকেরা মিছিল দেখলেই তিরিক্ষে হয়ে যায়। তা দুনিয়ার যে-কোন সমস্যা নিয়েই মিছিল হোক-না। অবশ্য, দু-তিন ঘণ্টা থেমে-থাকা ট্রাম-বাসের নিশ্বাস আটকানো ভিড়ে চেপটে থাকা খুব সুখকরও নয়। কিন্তু শিক্ষকদের মিছিলের জন্য রাগ করতে দেখিনি। শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতি হোক — এটা যেন প্রত্যেকেই চায়। সমবেদনায় অনেকের উক্তিও বেরিয়ে এল : শেষ পর্যন্ত মাস্টারদের মান খুইয়ে পথে নামতে হল ! কবে দেশের ...। যদিও যিনি এ-কথা বললেন, তিনিই হয়তো নিজের ছেলের গৃহশিক্ষককে পরীক্ষার পরের ছুটির মাসে মাইনে দিতে চাননা। কিন্তু এগুলো সামান্য মানবিক ত্রুটি। যেমন দেশের সমস্ত মানুষেরই প্রাথমিক শিক্ষা পাওয়া উচিত — এ-কথায় যিনি অটল বিশ্বাসী তিনিও যে নিজের বাড়ির ঝি-চাকরের লেখাপড়া শেখার কোন ব্যবস্থা করবেন, তার কোন মানে নেই।

ছাত্ররা রাজনীতির প্যাঁচে পড়ে ধর্মঘট মিছিল করে লেখাপড়া গোল্লায় দেয়, বিভিন্ন প্রদেশে তারা হাঙ্গামা বাধাচ্ছে। তাদের নিবৃত্ত করার প্রধান দায়িত্ব শিক্ষকদেরই — এতে কারুর সন্দেহ নেই। কিন্তু নিজে সন্দেশ খেয়ে অপরকে সন্দেশ খেতে বারণ করা যায় কি ? আজ শিক্ষকরাই ধর্মঘট-মিছিলে নেমেছেন, শক্ত গলায় জানিয়েছেন পরীক্ষার হলে গার্ডও দেবেন না। এতে ছাত্ররা নিজেদের দুষ্টুমির খোরাক পাবে নিশ্চিত। তারা বলবে, 'আরে যা-যা, স্যাররা নিজেরাই স্ট্রাইক করছে, আর আমরা পারিনা !' সুতরাং, শিক্ষকদের এই আন্দোলন সম্পর্কে মিশ্র

অনুভূতির প্রকাশ দেখতে পাওয়া স্বাভাবিক। শিক্ষকদের অভাব-অভিযোগের দাবি প্রত্যেকটা সত্যি, কোন বিবেকবান লোক তা অস্বীকার করতে পারেননা। ভিড়ের মধ্যে শোনা যাচ্ছে : 'মাস্টারদের এতটা না করলে কি চলত না ?' 'না হলে ওদের কোন দাবি মিটবে ?' এতটা চরম পথ না নিয়ে শিক্ষকরা যদি আরেকটু অপেক্ষা করতেন, সহ্য করতেন — এই-ই বেশির ভাগ লোকের মনে-মনে ইচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রীও বলছেন, তিনি শিক্ষকদের দাবি ন্যায়সংগত বলে মানেন, কিন্তু এখন যে আর টাকা নেই, সুতরাং চতুর্থ পরিকল্পনা পর্যন্ত অপেক্ষা না করলে —। ভিড়ের মধ্যে বিদ্যাসাগরের প্রতিধ্বনি শোনা যায়: 'কিন্তু মশাই তাকিয়ে দেখুন ওদের দিকে, ওদের তো শুধু দুরবস্থা নয়, এখন দুরাবস্থা একেবারে — আকার দেখলেই বোঝা যায় !'

অভাব শুধু টাকার নয়। শিক্ষকদের সামাজিক মূল্য এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। পেশার সম্মান ক্রমশ নেমে যাচ্ছে। স্কুল-কলেজের বাইরে শিক্ষকদের আর কেউ গ্রাহ্য করেনা। একই রকমের দুজন ভালো ছাত্র — একজন আই.এ.এস. হল, ছশো টাকা মাইনে, প্রবল প্রতিপত্তি। অপরজন শিক্ষক,-সুতরাং একশো পঁচাত্তর টাকা, নগণ্য মানুষ। সরকারের যে-কোন পেটি গেজেটেড অফিসারের ক্ষমতা আছে ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট দেবার, অন্য সার্টিফিকেটের কপি অ্যাটেস্ট করার। শিক্ষকের এই ক্ষমতা নেই। ছাত্ররা কাকে শ্রদ্ধা করবে — শিক্ষককে না ওই গেজেটেড অফিসারকে ? কার মতন হতে চাইবে ? পাশ করার পর আর কোন চাকরি না পেলে — তবেই লোকে কানামামা হিসেবে মাস্টারি নেয়। তিক্ততা এবং হতাশা জীবিকার প্রথম থেকেই জড়িত হয়ে যায়।

সবচেয়ে অসহায় লাগে প্রাথমিক শিক্ষকদের। কী পরাজিত আহত মুখ ! ডায়মন্ড হারবার থেকে তিনখানা রিজার্ভ করা বাসে এসে ওঁরা অনেকে ঐ মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন।

একই মিছিলে নাম-করা অধ্যাপক আর পাঠশালার মাস্টার। কিছু অধ্যাপকদের চেহারা দেখলেই চেনা যায়, খানিকটা বাবু-বাবু গন্ধ আছে। নোট বই এবং প্রাইভেট টিউশানির অতিরিক্ত আয়ের ছাপও আছে চেহারায়। তার পাশে গাঁয়ের মাস্টারদের ময়লা ধুতি, মলিন মুখ। প্রাথমিক ইস্কুল থেকেই খারাপ পড়ানো হয় বলে, কলেজের অধ্যাপকরা ভালো টিউশানি পান !

আমরা অধ্যাপক থেকে শুরু করে সকলেরই বেতন ও অন্যান্য সুযোগ বৃদ্ধি চাই। কিন্তু প্রথমেই নজর দেওয়া উচিত প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রতি — এবং উচিত অধ্যাপকদের সঙ্গে তাঁদের ব্যবধান খুব কমিয়ে আনা। যাতে শুধু বিদ্যার মান অনুযায়ীই নয়, অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিও প্রাথমিক শিক্ষক হতে পারেন। তাঁদের

দরকার বেশি। আজ স্বাধীনতার পর শিক্ষিতের সংখ্যা আরও কমে গেছে, সেদিনকার সরকারি রিপোর্টে জানা গেল। অর্থাৎ শিক্ষা-প্রসারে তো দূরের কথা, জন্মহারের সঙ্গেও শিক্ষার হার সমতা রাখতে পারছে না।

মিছিল শেষ হবার পর একটা টুকরো সংলাপ আমাদের কানে এল। একজন শিক্ষকের ক্যাম্বিশের জুতো পরা পায়ে একটি ডোরাকাটা শার্ট পরা ছেলে হুমড়ি খেয়ে পড়ল: আমায় চিনতে পারছেন?

— না তো।

— সেই যে স্যার, তিন বছর আগে অমুক ইস্কুলে...

— না, চিনতে পারলামনা।

— টেস্ট পরীক্ষার সময় আমি টুকলি করছিলাম। আপনি স্যার আমাকে ধরে হল থেকে তাড়িয়ে দিলেন! সেবার পরীক্ষা দেওয়াই হলনা স্কুল ফাইন্যাল! মাস্টারমশাইয়ের চোখে ভয় ঘনিয়ে এল। বখা ছেলেটি এখন কি আবার কোন প্রতিশোধ নিতে এসেছে নাকি? ছেলেটি কিন্তু বেশ বিনীতভাবেই পায়ের ধুলো মাথায় নিল। বলল, 'মাস্টারমশাই, আমি অন্যায় করেছিলাম ঠিকই।'

— তুমি পরের বার পাশ করেছিলে?

— না স্যার, আমার আর লেখাপড়া হলনা। চাকরিতে ঢুকে গেলাম।

— কোথায়?

— গান অ্যান্ড শেল ফ্যাক্টরিতে। আপনার আশীর্বাদে ভালোই আছি। ওভাব টাইম-ফাইম মিলিয়ে শ-চারেক হয়। আচ্ছা স্যার, চলি।

মাস্টারমশাই বহুক্ষণ বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। শীর্ণকায়, প্রায়-প্রৌঢ়। হাত কাঁপছে তাঁর। না-কান্না গলায় পাশের সঙ্গীকে বললেন, 'আমি বি. এ.-তে ডিস্টিংশন পেয়েছিলাম, জানেন? আমি ম্যাট্রিকে দুটো লেটার পেয়েছিলাম। আমি পরীক্ষায় টুকতে যাইনি বা ধরাও পড়িনি বলে আজ এতদিনে আমার মাইনে একশো সাতান্ন। জানেন, ঐ ছেলেটার আমি কতটা উপকার করেছি?'

১২

আমার একটি টেলিফোন করার জরুরি দরকার হল বিকেলের দিকে। তৎক্ষণাৎ আমি কাছাকাছি পানের দোকান থেকে একটা টাকা ভাঙিয়ে প্রচুর খুচরো করে নিলাম।

কাছেই টেলিফোন কম্পানির একটি শাখা অফিস। সেখানে পরপর ছটি

খোপের মধ্যে ছটি সাধারণের ব্যবহার্য টেলিফোন, একটি নেপালি দরোয়ান সেগুলি পাহারা দিচ্ছে। প্রত্যেকটি যন্ত্রের নিচে হিন্দি-বাংলা-ইংরেজিতে প্রচুর নির্দেশ লেখা আছে। পড়লে মনে হয় যেন বিরাট একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালাতে হবে এখুনি। এবং ওর সঙ্গে যেন একটা অলিখিত বাক্যও যুক্ত আছে, সাবধান, ৪৪০ ভোল্ট, অসাবধান হইলেই মৃত্যু! আমি সাধারণত এসব যন্ত্রপাতি থেকে দূরেই থাকার চেষ্টা করি, কিন্তু সেদিন বিষম প্রয়োজন ছিল একটি খবর দেবার।

খুব সাবধানে মাথা ঠাণ্ডা করে প্রথমে ইংরেজি নির্দেশ তারপর বাংলা অনুবাদ পড়ে বিষয়টি বুঝে নেবার চেষ্টা করলাম। কীরকম যেন মনে হল, ঐ নির্দেশ পুরোপুরি মানতে হলে আমার চারটে হাত থাকা দরকার। আমি জামার তলা থেকে আমার লুকোনো আর-দুটো হাত বার করে চার হাতেই কাজ শুরু করলাম। প্রতিমুহূর্তে নির্দেশাবলির দিকে চোখ রেখে। যথারীতি রিসিভার তুলে, চাক্তি ঘুরিয়ে বোতাম টেপার পর ওপার থেকে কী যেন একটা গলা ভেসে এল, আমি পয়সা দিয়ে কথা বলা শুরু করতেই কড়-র কড়-র কট কট ইত্যাদি কিছু আওয়াজ হয়েই একেবারে চুপ! আর টুঁ-শব্দটি নেই। অর্থাৎ টেকনিক্যাল ভাষায় যাকে বলে 'ডেড'। রিসিভার রেখে দিলাম। কী ভুল হয়েছে? নির্দেশনামায় আবার চোখ বুলোতেই দেখলাম, মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ না-হলে একটা বিশেষ বোতাম টিপলেই পয়সা নাকি ফিরে পাওয়া যায়।

বোতাম ধরে টেপাটেপি করলাম, সেটা গোঁয়ারের মতো চুপ করে রইল। তাতে দুঃখিত হলামনা, কারণ, যে-পয়সা একবার পকেট থেকে বেরিয়ে যায়, তা আবার ফিরে আসবে এমন অলৌকিক ব্যাপারে আমার বিশ্বাস হয়না। বুঝতে পারলাম, আমারই কোন ভুল হয়েছে, নিজের বোকামি আর কেউ দেখে ফেলেছে কিনা এদিক-ওদিক তাকিয়ে আমি সুট করে পাশের কুঠরিতে ঢুকে গেলাম।

পাশের খোপে ঝঞ্ঝাট কম, রিসিভার তুলতেই পিঁ-পিঁ-পিঁ আওয়াজ এল। অর্থাৎ এনগেজড্। পাবলিক টেলিফোন কী করে এনগেজড্ হয়, এ-তত্ত্ব ভাবতে-ভাবতে আমি এলাম তার পাশের ঘরে। একটি লোক সেই মুহূর্তে সেখান থেকে বেরিয়ে এসেই বলল, 'এটায় হবে না, আমি অনেক চেষ্টা করলাম। ফোনটা খারাপ।' কীধরনের খারাপ, কড়-কড় না পিঁ-পিঁ অর্থাৎ আগের ঘরের মতোই।

আমি চতুর্থ ঘরে গেলাম। এখানে স্পষ্ট ডায়াল টোন। সব ঠিকঠাক হল। ওপাশ থেকে গলা পেলাম। এবার পয়সা ফেলে বোতাম টেপা। তাও নিখুঁত। ওপার থেকে ভেসে আসছে, 'হ্যালো, হ্যালো?' আমি জবাব দিলাম। উত্তর এল, 'জবাব দিচ্ছেননা কেন? কে?' — আমি অত্যন্ত কাতর গলায় নাম জানালাম। উত্তর এল, 'কী আশ্চর্য কথা বলছেননা কেন? কে আপনি?' — আমি কণ্ঠস্বর

উচ্চগ্রামে তুলে তবু মিনতির সুর বজায় রেখে বললাম, 'আমি, আমার এই নাম, চিনতে পারলেনা ?'

— কে আপনি ? ধেৎ ! কথা বলছেননা কেন ?

— এত কথা বলছি তবু শুনতে পাচ্ছনা ? তুমি কি ভগবান নাকি ?

— টেলিফোন করে একটাও কথা বলছেননা ! কে আপনি ?

আমি তখন ঘর কাঁপিয়ে গর্জন করছি। ওপার থেকে তবু সেই শুনতে না পাবার বিরক্তি। কট করে লাইন কেটে গেল। এবং বোতাম টিপে পয়সা ফেরত এলনা।

পঞ্চম ঘরে গিয়ে, সেই ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময় যে-ভাবে 'ড্যাফোডিল' কবিতার সাবসট্যান্স মুখস্থ করেছিলাম সেইভাবে নির্দেশনামা মুখস্থ করে নিজেই নিজের পড়া ধরলাম। তারপর প্রতিটি জিনিশ যে ঠিকঠাক করেছিলাম তা আদালতে হলপ করে বলতে পারি। এবার পয়সা ফেলে বোতাম টেপার পর আবার সেই পরিচিত গলা। আমি জীবনের চরম অনুনয়ের সুরে বললাম, আমার নাম অমুক, দয়া করে এবার আমার কথা শোন। ওপাশ থেকে আবার ভেসে এল, কে ? কথা বলছেননা কেন ?

আমি প্রায় কান্নায় ভেঙে পড়ে বললাম, 'হে টেলিফোনের দেবতা, দয়া করে আমার কণ্ঠস্বর ওপারে পৌঁছে দাও। আমি কি বোবা হয়ে গেছি, না পৃথিবীর মানুষ আর আমার ভাষা বুঝবেনা ?'

ওপার থেকে শুনলাম, 'মা, দেখো, সেই কোন বখা ছেলে বারবার টেলিফোন করে বিরক্ত করছে। কথাও বলছেনা। একটা কথা বললে এমন শুনিয়ে দিতাম। দূর ছাই !' কট।

আমার পরম বান্ধবী আমাকে বখা বলে আখ্যা দিলেন, নিজের কানে শুনলাম। একটি উত্তর দিতে পারলামনা। পয়সাটা এবার ফেরত দেবে অন্তত, দেবতা ? না।

পাশের কামরায় বাইরেই দয়া করে নোটিস ঝোলানো আছে, এই টেলিফোন যন্ত্রটি বিকল। যাক, আর পয়সা গচ্চা গেলনা।

নেপালি দরোয়ানটি বাংলা-ইংরেজি বোঝেনা দেখা গেল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ব্যাপার, তোমাদের মেশিন খালি পয়সা খায়, অথচ কাজ করেনা ?' লোকটা বলল, 'কমপ্লেন-বুক ? হাঁ সাব, ইধার !' অর্থাৎ দিনের মধ্যে বহুবার ঐ খাতাটি তাকে বার করতে হয়। বেশ যত্ন করে বাঁধানো খাতা। আমি উল্টেপাল্টে দেখলাম। বহুদিন এমন একা-একা হাসিনি। অসম্ভব মজার-মজার মন্তব্যে ভরা। শেষদিকের কয়েকটা মন্তব্য এই রকম :

পয়সাও নষ্ট হল, কাজও হলনা। আমার নাম-ঠিকানা দিয়ে গেলাম ! কম্পানির উচিত আমার বাড়িতে ষাট নয়া ফেরত পাঠানো।

আরেকজন :

মানুষ ঘুষ খায়, যন্ত্রও বা খাবেনা কেন ? আমি প্রত্যেকটা টেলিফোনের জন্য দুবার করে পয়সা দিয়েছি, তবু কোন কাজ হয়নি। যন্ত্রও মানুষের মতো নিমকহারাম !

এর নিচে লেখা, ছনম্বর ঘর ছাড়া আর সবকটি টেলিফোনই ঠিক আছে ! পরীক্ষা করে দেখেছি। ইতি, টেকনিক্যাল ইন্সপেক্টর।

এই লেখাটা একটু আগের, তখনও ভালো করে কালি শুকোয়নি। সুতরাং আমি আর-কিছু লিখে সময় নষ্ট করলামনা। খাতাটা ফেরত দিয়ে আমি ছুটে গেলাম পোস্ট-অফিস। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এটিও একটি শাখা পোস্ট-অফিস, পূর্বের শাখা টেলিফোন ভবনটির মতো। নদীর চেয়ে শাখা নদীগুলোর যেমন বিক্রম বেশি, তেমনি শাখা অফিসগুলো অকৃতকার্যতায় আসল অফিসগুলোকে ঢের ছাড়িয়ে যায়। যে-কোন শাখা পোস্ট-অফিস এ-কৃতিত্বে জি. পি. ও.-কেও টেক্কা দিতে পারে।

পোস্ট-অফিসের টেলিফোনের সামনে দু-তিনজন লোক দাঁড়িয়ে। একটু অপেক্ষা করতেই হঠাৎ আমার মনে হল, এত ঝঞ্ঝাটে আমি নম্বরটা ভুলে গেছি। শেষ দুটো সংখ্যা তো বারবার উল্টে যাচ্ছে। মোলায়েম গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনাদের টেলিফোন গাইডটা কোথায় ?'

— চুরি গেছে। নেই।

পাশ থেকে একজন ভদ্রলোক রুক্ষ গলায় বললেন, 'আপনাদের তো মশাই যখনই খোঁজ করা হয় টেলিফোন গাইড, তখনই বলেন, চুরি গেছে। আনিয়ে রাখতে পারেননা ?'

— কতবার আনব ? বারবার চুরি যায় যে ! আপনারা কমপ্লেন করুন-না ! পাশের স্ট্যাম্পের ঘর থেকে মেয়েটি মিষ্টি হেসে বলল, 'জানেন, মোটা শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা সত্ত্বেও ইংলন্ডের গির্জা থেকে বাইবেল চুরি যেত ?'

মেয়েটি সদ্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়েছে বুঝলাম। কিন্তু টেলিফোন বই চুরি করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কার কী লাভ হয়, কোন্ ধর্ম-সাধনায় সিদ্ধি পায়, তা আমার বোঝার কথা নয়। স্থান ত্যাগ করে ছুটে গেলাম রাস্তার উল্টোদিকের ডাক্তার-খানায়। বিনীত ভাবে বললাম, 'দয়া করে পয়সা নিয়ে একটা টেলিফোন করতে দেবেন ?'

— টেলিফোন ? এই বিকেলবেলা ? সন্ধের পর আসবেন।

এরকম কথাও আমি জীবনে শুনিনি। আমার টেলিফোন করা দরকার এখন, আমি আসব সন্ধেবেলা ? সবিনয়ে জানালাম, 'সন্ধেবেলা লোকটির সঙ্গে আলাপ-পরিচয় বা যা-কিছু করবার জন্য আমার আসতে আপত্তি নেই, কিন্তু টেলিফোনটি আমার এখুনি করা দরকার।' তখন আসল ব্যাপারটা জানা গেল। ওর টেলিফোনের চাক্তিতে তালা আটকানো, সন্ধেবেলা ডাক্তারবাবু স্বয়ং এসে তালা খুলবেন। এখন কল রিসিভ করা যায়, কিন্তু বাইরে করা যায়না। যাই হোক, ভদ্রলোক দয়া করে আমাকে গাইডটা দেখতে দিলেন। নম্বরটা এবার কাগজে লিখে ফিরে এলাম পোস্ট-অফিসে।

টেলিফোনের সামনে আর কোন লোক নেই। ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীটি একটি বই পড়ছেন। এখানে অন্যান্য পোস্ট-অফিসের মতো লোকে এসে নিজে ডায়াল ঘুরিয়ে ফোন করতে পারেনা। একজন লোক শুধু এজন্যই রাখা হয়েছে, যিনি লোকের মুখে নম্বর শুনে নিজে চাক্তি ঘুরিয়ে রিসিভার তুলে দেবেন। আপাতত সেই লোকটি বই পড়ছেন। মলাট দেখে বুঝলাম, গোয়েন্দা গল্প। দু-তিনবারের ডাকে সাড়া না দিতে লোকটির প্রতি মায়াবশত আমি একটু অপেক্ষা করতে লাগলাম। আহা, এই মুহূর্তে হয়তো সুন্দরী নায়িকার সামনে পিস্তল তুলে দাঁড়িয়ে আছে দুর্বৃত্ত। এখন কি আর অন্যদিকে মন দেওয়া যায়।

দণ্ড পল মিনিট কাটতে লাগল। শেষ পর্যন্ত আর না থাকতে পেরে আমি কাচুমাচু গলায় বললাম, 'দয়া করে আমাকে একটা নম্বর ডায়াল করে দেবেন ?' একবার দুবার তিনবার বলার পর লোকটি উত্তর দিলেন, 'হবে না, লাইন আউট অব অর্ডার।'

— সে কী। এই তো দেখলাম, কয়েকজন টেলিফোন করছিলেন ?

— এ লাইন কখনও ভালো থাকে, কখনও খারাপ হয়। ভূতুড়ে কাণ্ড মশাই।

এবার আমার পক্ষে মেজাজ ঠিক রাখা কষ্টকর হল। বেশ রুক্ষ গলায় বললাম, 'আপনি ওটা কাউন্টারের ওপর তুলে দিন, আমি দেখছি ওটা ভালো কী খারাপ !'

লোকটি এবার হাতের বই মুড়ে রেখে ধীরে-সুস্থে চোখ তুলে বললেন, 'আপনি রাগ করছেন ?' — তারপর, যে ভাবে লোকে ব্যবসার সঙ্গীকে গোপন সুখবর বলে, তেমনি মুচকি হেসে, এক চোখ কুঁচকে লোকটি আমাকে বললেন, 'কমপ্লেন করুন-না। ঐ তো রয়েছে খাতাটা ! লিখুন-না যা ইচ্ছে।'

তখন বিনা বাক্যব্যয়ে বেরিয়ে গিয়ে যেখানে আমার টেলিফোন করা দরকার ছিল, সেই ঠিকানায় আমি ট্যাক্সি করে উপস্থিত হলাম।

কিন্তু কমপ্লেন-বুক আমাকে কয়েকদিন তাড়া করেছে। যে-কোন সরকারি অফিসে গিয়ে কোন কিছু নিয়ে রাগারাগি করলেই দেখছি তারা কমপ্লেন-বুক

এগিয়ে দেয়। যেন এটা একটা বেশ মজার ব্যাপার। পরম দুর্মুখকে চুপ করিয়ে দেবার একমাত্র অস্ত্র। খাতাটা এগিয়ে দেবার সময় সকলেরই মুখ বেশ হাসি-হাসি থাকে।

রাত্রি সাড়ে এগারোটায় শ্যামবাজার থেকে দমদমের শেষ বাস ছাড়ে। এগারোটা আন্দাজ পৌঁছে দেখি বিরাট কাণ্ড। তখনই সার্ডিন মাছের টিনের মতো ভর্তি হয়ে একটি বাস দাঁড়িয়ে আছে। বাসের সামনেটা ভিজে, ভেতরের লোকদের ঘাম গড়িয়ে এসেছে। প্রতি দশ মিনিট অন্তর বাস ছাড়ার নিয়ম হলেও শুধু আজ এই একটা বাসই ছাড়বে আধঘণ্টা পরে শেষ বাস হিসেবে, আর গাড়ি নেই, বাইরে তখনও শ-দুয়েক লোক দাঁড়িয়ে।

ছোট গুমটিঘরের মধ্যে দু-তিনজন লোক টেলিফোন আর খাতা পেন্সিল নিয়ে কী যেন করছিলেন। সেই ঘর ঘিরে একদল যাত্রী উত্তেজিত গলায় কত কী বোঝাবার চেষ্টা করছে। ভিতরের লোকেরা একদম গ্রাহ্যই করছেননা। দু-একজন শুধু তিরিক্ষে গলায় বলছেন, 'আর বাস নেই তো কী করতে পারি আমরা ? পায়ে হেঁটে বাড়ি যান !'

এমনসময় একটি লোককে দেখলাম। দেখার মতো চেহারা। বিশাল লম্বা ও চওড়া, পাজামা ও পাঞ্জাবি পরনে — একটি চলন্ত দৈত্য ভিড়ের সকলের মাথা ছাড়িয়ে সেই গুমটি ঘরে উঁকি মেরে মেঘ-গর্জনের মতো গলায় বলল, 'কী ব্যাপার, আর বাস নেই কেন ?'

একসঙ্গে বহু কণ্ঠের বহু উত্তর। লোকটি সবাইকে এক ধমক দিল, 'আপনারা চুপ করুন। গুমটির লোকেরা জবাব দিক। বাস নেই কেন ?'

—নেই তো আমরা কী করব ? আপনারা ওপরওলাকে জানান। কমপ্লেন করুন। ঐ তো কমপ্লেন-বুক রয়েছে, জানান-না !

— কমপ্লেন-বুকে লিখব ? লোকটা হা-হা করে হেসে উঠল। আমার সঙ্গে কমপ্লেন-বুক নিয়ে ইয়ার্কি করছেন ? ওসব রঙ্গরস বুঝি আমি জানিনা ? ও-বইতে লিখে কী লাভ হয় আমি জানি। দেখবেন, আমার কমপ্লেন-বুকে লেখার কায়দা ?

তারপর লোকটি দুই বিরাট থাবা দিয়ে দমদম করে পেটাতে লাগল গুমটির টিনের দেয়ালে। পুরো গুমটিঘরটা ধরেই নাড়া দিতে লাগল। সঙ্গেসঙ্গে ভিড়ের অনেকেও হাত মেলাল তার সঙ্গে। সেই লোকটা হাসতে-হাসতেই বলল, 'হয় বাস চাই, নইলে এ-গুমটিঘর আজ উড়ে যাবে ! লাগাও ! দুম, দুম !'

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ভোজবাজি ঘটে গেল। কোথা থেকে চলে এল দুটো খালি বাস। একটা ডবল ডেকার এসেও অপেক্ষা করতে লাগল — যদি যাত্রী-সাধারণের সেবার জন্য লাগে। একাধিক সরকারি অফিসার ছোটাছুটি করে দেখতে

লাগলেন যাত্রীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। হাতজোড় করে বলতে লাগলেন, আগে প্রত্যেকটি যাত্রীর বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করে, তবে তাঁরা নিজেরা বাড়ি ফিরবেন। তাদের কাজই তো জনসাধারণের সেবা।

লম্বা লোকটি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে প্রত্যেকটি লোককে আগে বাসে তোলার ব্যবস্থা করে দিল। তারপর, আমি কাছাকাছি ছিলাম বলে, আমার দিকে ফিরে প্রবল হাস্যে বললেন, 'হাঃ! আমাকে দেখাচ্ছে কমপ্লেন-বুক! যে-রোগের যে-ওষুধ! কিংবা যে-ক্লাসের যে-রকম অঙ্ক, বুঝলেন? অথবা যে-বিয়ের যে-মন্তোর!'

আমি লোকটির কাছ থেকে সরে গিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে উঠলাম।

১৩

আবদুল সকালবেলা এসে বলল, 'আপনার কাছে বিদায় নিতে এলাম, আবার কবে দেখা হয় না-হয়।'

আবদুলের মতো এমন চমৎকার ছেলে আমি খুব কম দেখেছি। সেই দুর্লভ ধরনের মানুষ যারা হাসতে-হাসতে দুঃখের কথা বলতে পারে। আমার চেয়ে বয়েসে বেশ ছোট, এবার বি.এ. পরীক্ষা দেবে, পড়াশুনোয় খুব ভালো, এরইমধ্যে ইংরিজি খবরের কাগজে চিঠি লেখা শুরু করেছে। দেখতে সুন্দর নয় আবদুলকে —মুখের গড়ন খানিকটা চৌকো ধরনের, অস্পষ্ট চামড়ার রং, সীমাবদ্ধ চোখ, তাছাড়া সেলুনে কায়দার চুলের ছাঁট দিতে শেখেনি — একেবারে ভিড়ের মধ্যে মিশে যাবার মতো চেহারা। কিন্তু মুখে এমন একটা ঝলমলে কৌতুক লেগে থাকে সবসময় যে, ওর মুখের দিকে তাকালেই দর্শকের মুখেও একটা প্রসন্নতা আসতে বাধ্য। চব্বিশপরগনার একটা গ্রাম থেকে কলকাতায় এসেছে লেখাপড়া করতে — ওদের আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে কেউ কোনদিন ইস্কুল-মাদ্রাসা পার হয়নি, আবদুলই প্রথম এসেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে, ওর বাবা এখনো চাষের কাজ করে। বাড়ি থেকে পয়সাকড়ি দেবার সামর্থ্য নেই — কলকাতায় থাকে এখানে-সেখানে, কোন চাল-চুলো নেই — ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ পায় ১৫ টাকা — সেটা মূলধন করে সারা মাস মাথা খাটিয়ে চালিয়ে দেয় — অর্থাৎ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের চরিত্রের মতো — গাঁয়ের ছেলে শহরে এসে খেয়ে না-খেয়ে লেখাপড়া শেখার জন্য প্রাণপণ করেছে। কোনদিন হয়তো, ও আমাকে এসে বলল, 'আপনি পান খান, নীলুদা?'

— মাঝে-মাঝে দু-একটা। কেন বলো তো?

— কাল একটা অদ্ভুত জিনিশ আবিষ্কার করলাম। কাল রাত্রে পকেটে দশ নয়াপয়সা ছিল তো, ভাবছিলাম কী করি, কী করি। ক্ষিদে লেগেছিল — চার পয়সার ছাতু খেলাম, বুঝলেন। মুখটা একটু বিশ্রি-বিশ্রি লাগছিল — তারপর, তাই চার নয়া দিয়ে একটা মিঠে পান খেলাম। তখন জানেন, ভারি আশ্চর্য, বোধহয় পানের সঙ্গে ছাতুর একটা কেমিক্যাল রি-অ্যাকশান হয়, পেট ভরে গেল — আর মনটাও খুব ভালো হয়ে গেল — কীরকম যেন ফুরফুরে লাগতে লাগল — ভাবলাম উড়তে উড়তে বাড়ি যাই। আপনি একদিন ছাতুর সঙ্গে পান খেয়ে দেখবেন?

আবদুলের সঙ্গে কথাবার্তা আমাকে একটু সাবধানে বলতে হয়। ওর সরলতার কাছে প্রতিমুহূর্তে আমার অপমানিত হবার ভয় থাকে। গতকাল রাত্রে যে শেষ দশ নয়াপয়সা নিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করেছে আজ সে কোন মহাশূন্য নিয়ে গবেষণা করবে — সে-সম্পর্কে আমার প্রশ্ন করা চলবেনা। প্রত্যেকের জীবন তার নিজের — তবু আমরা অপরের জীবন নিয়ে কথা বলার জন্য আকুলি-বিকুলি করি।

আমিও আবদুলকে সৎপথে আনার জন্য কিছু-কিছু চেষ্টা করেছি। গ্রামের ছেলে, আগে বিড়ি-সিগারেট খেতনা, আমিই সিগারেট ধরিয়েছি — এখন, এই মাস-দুয়েকের মধ্যেই ছাই ঝাড়ার সময় দিব্যি আঙুলে টুসকি আওয়াজ করতে শিখে গেছে। টিউশানি করতে গিয়ে কী কী উপায়ে পড়ানো ফাঁকি দিতে হয়, সে-সম্পর্কেও উপদেশ দিয়েছি ওকে। ট্রামে-বাসে ভাড়া না-দেবার আমার নিজস্ব পদ্ধতিগুলি শুনে-শুনেও ও এখনো ঠিকমতো রপ্ত করতে পারেনি যদিও। এছাড়া, আর-একটি কথা আমি ওকে প্রায়ই বলে থাকি, 'পড়াশুনো ছেড়ে দাও আবদুল. পড়াশুনো করে কী হবে?' এর উত্তরে ও একটা বেয়াড়া ধরনের প্রশ্ন করে, 'পড়াশুনো না-করে কী হবে, সেটা আগে বলুন!' পড়াশুনো ছেড়ে গ্রামে ফিরে গিয়ে বাবার সঙ্গে মিলে চাষবাস করা অনেক ভালো — সেটা ও কিছুতে বুঝবেনা। অর্থাৎ একাকীত্ব, মুক্তি, আত্মপ্রকাশ ইত্যাদি কয়েকটা আধুনিক সাহিত্যের অসুখ ওর মধ্যে ঢুকে গেছে। ও এখন নাগরিক জীবন চায়।

অনেকদিন আবদুলের সঙ্গে দেখা হয়নি। হঠাৎ এসে ও বিদায় নেবার কথা বলতে একটু আবাক হলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'গ্রামে ফিরে যাচ্ছ নাকি?'

— না, বিদেশে। পাকিস্তানে। ঢাকা যাব।

— বেড়াতে? কবে ফিরবে?

— আর ফিরব না। ওখানেই থেকে যাব।

আমি হঠাৎ চুপ করে গেলাম। বুঝলাম, নিশ্চয়ই একটা-কিছু গুরুতর ঘটেছে! সামান্য কারণে আবদুলের মতো ছেলে বিমর্ষ হয়না। আবদুল কিন্তু

পরমুহূর্তেই হেসে উঠে বলল, 'কী, জিজ্ঞেস করলেননা, কেন যাচ্ছি?'

বললাম, 'তুমিই বলো-না।'

— একা-একা থাকি। আজকাল বড় মন খারাপ লাগে।

— ঢাকায় কোন মেয়ের সঙ্গে প্রেম হয়েছে বুঝি?

— প্রেম তো এখানেই একটা মেয়ের সঙ্গে হয়েছিল, মুসলমান বলে পাত্তা দিলনা। না, ইয়ার্কি নয়, নীলুদা আজকাল টাকা-পয়সা একদম কুলিয়ে উঠতে পারছিনা। তাছাড়া সবসময় একটা অস্বস্তি।

— অস্বস্তি?

— কী জানেন, কাগজে টিউশনির বিজ্ঞাপন দেখে-দেখে হয়তো গেলাম — সব কথাবার্তা হল, যেই নাম জিজ্ঞেস করল, অমনি — হেসে ফেলল আবদুল — লোকগুলো এমন মজার, চট করে মিথ্যে কথাও বানাতে পারেনা। বলে, 'এখন টাকার টানাটানি — কয়েকমাস মাস্টার রাখব না এখন!' আসলে সব ঠিক হবার পর আমি মুসলমান শুনেই যে এমন মজার মুখ করে লোকেরা ...

— অনেক মুসলমানও তো বাড়িতে প্রাইভেট টিউটর রাখে, সেখানে যাওনা কেন?

— আমি মুসলমান বলেই কেন মুসলমানের কাছে যাব? আমি মানুষ, যে-কোন মানুষের কাছে যাব।

— অত আদর্শ রাখলে চলেনা আবদুল। বেঁচে থাকা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা। মুসলমানের কাছে গেলে যদি চাকরি পাও — সেখানেই যাবে!

— তাও গিয়েছিলাম। কিন্তু জানেন তো, এদেশে মধ্যবিত্ত মুসলমান নেই। বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণী আছে হিন্দুদের মধ্যেই। আর বড়লোক মুসলমানেরা এক অদ্ভুত চীজ। সত্যি বলছি। তারা থাকে সাহেবী কায়দায় — তারা চায় প্যান্টকোট-পরা ইংরেজি-বলা মাস্টার — তা হিন্দু মুসলমান অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান যাই হোক-না। আমার মতো ইস্তিরি না-করা জামা, মসলা ধুতিপরা মাস্টার চায়না। অথচ আমি কি ইংরিজি খারাপ জানি?

— বড়লোক হিন্দুরাও তাই। দুনিয়ার এমন-কোন বড়লোক নেই, যে নিজের বাড়িতে ময়লা জামাকাপড়-পরা মাস্টার রাখতে চায়।

আবদুল সরল হেসে বলল, 'কী মুশকিল, টাকা না পেলে প্যান্টকোট কিনব কী দিয়ে?' ওর বলার ভঙ্গিতে আমাকেও হেসে উঠতে হল।

— একজন দোকানদারের কাছে গিয়েছিলাম— খাওয়া-থাকার বদলে দোকানের হিশেবপত্র রাখতে হবে। লোকটা সব ঠিক করার পর আমি মুসলমান শুনে বললে কী জানেন? বললে, ভাই তোমাকে না নেবার কোন যুক্তিই নেই কিন্তু তবু নিতে

পারছিনা। মাপ করো ভাই। লোকটার কাচুমাচু মুখ দেখে এমন মায়া হল আমার। সত্যি খুব ভালো লোকটা, কিন্তু সংস্কারের কাছে অসহায়। আবার দু-একজন চোখ রাঙায়ও বটে, স্পষ্ট অপমান করে — কিন্তু তাতেও কিছু মনে করিনা। ও তো স্বাভাবিক। মানুষ তো আর একরকম হয়না। এখন কারুর কাছে যেতেই লজ্জা হয়। নিজের নাম বলতে যদি লজ্জা হয় — তার চেয়ে খারাপ কিছু আছে? সেইজন্য জানেন, সবসময় একটা অস্বস্তি লাগে, কীরকম কষ্ট হয়, বুকের মধ্যে যেন ফোঁটা-ফোঁটা রক্ত পড়ছে অনবরত। নিজেকে খুব একা মনে হয়।

আমি চুপ করে ভাবতে লাগলাম, আবদুল কি একাই এরকম পরিস্থিতিতে পড়েছে — না ওর মতো সব মুসলমান ছেলেদেরই এ-অবস্থা? কী জানি! এমনও হতে পারে, আবদুলের একাকীত্ববোধের সঙ্গে ধর্মভেদের কোন সম্পর্ক নেই। কাফকা কিংবা কামুর লেখাটেখা পড়েই বোধহয় এসব মাথায় ঢুকেছে! হয়তো এসব সাহিত্যের অসুখ। কিন্তু অস্বস্তির কারণ যখন ও নিজেই বার করেছে — তখন সেইটাই সত্য। অন্য কোন ধারণা কি ওকে কোন সাহায্য করতে পারবে? কিন্তু ঢাকায় গেলেই ওর এই ভাব সেরে যাবে ও কী করে ভাবল? — সে কথা ওকে জিজ্ঞেস করলাম।

— জানিনা ওখানে গেলেই কেটে যাবে কিনা। তবু দেখা যাক। জানেন, এখানে তো আমার কোন বন্ধুও নেই। কলেজে একটা ছেলের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হল— বনেদি ব্রাহ্মণবংশের ছেলে — অনেক কিছু জানে, অনেক আলোচনা করতাম দুজনে। ছেলেটাকে মনে হত সত্যিকারের উদার। ওর সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পেতাম। একদিন বিকেলে একটু একা-একা লাগছে, ওর বাড়িতে গেলাম। ছেলেটা এমন তিনতলা জানলা থেকে উঁকি মেরে বলল, খুব ব্যস্ত, দেখা করতে পারবে না। আচ্ছা দেখুন তো কী বোকা — আমার কী ক্ষতি হল — ওকেই তো নিজের সঙ্গে জোচ্চুরি করতে হল! আর-একটা ছেলে — বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুব আদরযত্ন করে খাওয়ায় মাঝে-মাঝে — খাতিরের ঠেলায় আমি ব্যতিব্যস্ত — পাড়ার লোককে ডেকে-ডেকে পরিচয় করিয়ে দেয় যে, আমি মুসলমান। ব্যাপারটা কী বুঝতে পারলেন তো? আমি ঠিক বুঝে নিয়েছি — মহত্ত্ব দেখানো। তারপর আর আমি যাইনা, কেন যাব বলুন!

আবদুলের কথা বলার বিশেষ গুণ এই যে কোন বিদ্রূপ বা দুঃখের চিহ্নমাত্র নেই। কথার ঝোঁকে কথা বলে যায়।

— জানেন নীলুদা, মুসলমানরা আরও খারাপ। আমি তো অনেক চাষাভুষো গরিব লোকের সঙ্গে মিশে দেখেছি। গরিব হিন্দুদের মধ্যে সাধারণত মুসলমানদের সম্পর্কে কোন রাগ বা এড়িয়ে যাবার ভাব নেই। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে আছে।

আমি তো মুসলমানদের বস্তিতে থাকি। দেখেছি হিন্দুদের ওপর সবসময়েই একটা রাগ আর হিংসে নিয়ে কথা বলে। খুব খারাপ!

— স্বাভাবিক এটাও। ওরা এদেশে সংখ্যালঘু — তাই হয়তো ভাবতে পারে ওদের ওপর অবিচার করা হচ্ছে।

— শুধু তাই না, কুসংস্কারও বেশি। শিক্ষিত ছেলেদের মধ্যেও আছে। আমি কয়েকটা মুসলমান ছেলের মেসে বসে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসঙ্গীত গাইছিলাম — ওরা কী বলল জানেন? আমি হিন্দুর গান গাইছি!

— আমি এরকম কথা কখনো শুনিনি! এটা তোমার বাজে কথা। আমি অনেক মুসলমান ছেলেকে জানি — যারা রবীন্দ্রসঙ্গীত বলতে পাগল!

— আপনারা একটা ছোট গণ্ডির মধ্যে থাকেন — তার বাইরে একটা বিরাট বাংলা দেশ আছে। আমি অনেক মুসলমানকে বলতে শুনছি যে রবীন্দ্রনাথ বা জীবনানন্দ দাশ হিন্দু সাহিত্য লিখেছেন—। কিন্তু কোন হিন্দু কি কখনো বলে, নজরুল ইসলাম বা মুজতবা আলী ইসলামি সাহিত্য লিখেছেন? কখনো বলে না! আমাদের মধ্যে এরকম কুসংস্কার বেশি আছে।

— বলুক-না, তাতে কী ক্ষতি হয়েছে? তোমার তা নিয়ে অত মাথা ঘামাবার কী দরকার?

— আপনি আমাকে খুশি করার জন্য সত্যি কথাটা এড়িয়ে যেতে চাইছেন!

আমি হঠাৎ অত্যন্ত চটে গিয়ে বললাম, 'বাজে বোকো না! তুমিও আমাকে খুশি করার চেষ্টায় মুসলমানদের নিন্দে করতে শুরু করেছ।' আবদুল চটপট উত্তর দিল, 'আপনি একথাটা রাগের মাথায় না ভেবে বললেন!'

আমি একটু অনুতপ্ত হয়ে চুপ করে রইলাম। তারপর বললাম, 'আবদুল, আমার বন্ধুদের মধ্যে কেউ হিন্দু কেউ মুসলমান — কিন্তু কখনো তা মনেও পড়েনা। তুমি আজ সকালে এসে হঠাৎ এসব প্রসঙ্গ তুললে কেন? আমি কি জানিনা, দেশে এ-সমস্যা আছে? থাকবেই। দুই জাত বা দুই ধর্ম বা দুরকম গায়ের রঙ — যে-কোনো একটা হলেই হল... এরকম মানুষ কোথাও শান্তিতে পাশাপাশি থাকতে পারেনা। ঝগড়া-মারামারির জন্য মানুষের একটা তো খেলনা চাই। তুমি আমি পাশাপাশি বসে থাকলে যুক্তিতর্ক মেনে কত কথা হবে। কিন্তু যেই দুপাশে দুটি জনতা, বা দুটো দেশ — অমনি আর কোন যুক্তি টিঁকবেনা। এসব নিয়ে আর ভাবতে চাইনা — কারণ জানি তোমার বা আমার ইচ্ছে-অনুসারে কিছুরই বদল হবেনা। আজ গোটা পৃথিবীতে সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের ইচ্ছে-অনুযায়ী, কোন দেশেরই রাজনীতি চলছেনা।

— রাজনীতি ছেড়ে দিন, সাধারণ মানুষ?

— সেখানেও ঐ সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরুরা এই দুই দলে রেশারেশি, অবিশ্বাস, ঘৃণা থাকবেই। সংখ্যালঘুরা সবসময়ে মনে করবেই তারা নির্যাতিত, সত্যিকারের নির্যাতিত হোক বা না-হোক। এদেশে মুসলমানরা, পাকিস্তানে হিন্দুরা, আমেরিকায় নিগ্রোরা, সাইপ্রাসে তুর্কিরা, ইউরোপে ইহুদিরা। আচ্ছা, ওটা ভুলে যাও। মনে করো কবি আর অকবি — এই দু-দল। সারা পৃথিবীতেই কবিরা সংখ্যালঘু, অকবিদের কাছে নির্যাতিত। কবি শুনলে প্রেমিকার বাবা বাড়ি থেকে দূর করে দেয়, অপিসে চাকরি হয়না, বইয়ের দোকানে মুখ বাঁকায়, মাছওলা ঠকায়, রাস্তায় পুলিশে তাড়া করে, বাড়িওলা বাড়ি ভাড়া দেয়না—

আবদুল হেসে বলল, 'আপনি কথাটা অন্যদিকে নিয়ে যাচ্ছেন।' তারপর ছেলেমানুষের মতো উত্তেজিত হয়ে আবদুল বলল, 'আমি লোককে বোঝাতে চাই। কেন মানুষে-মানুষে এমন তফাত হবে — ধর্মের জন্য ? আমি এখানে পারলামনা, হেরে গেলাম। ঠিক করেছি, পাকিস্তানে গিয়ে মুসলমানদের বোঝাব। মুসলমানরা বেশি পেছিয়ে আছে — আমি ওদের বোঝাব — পাকিস্তানে আমার বেশি স্বাধীনতা থাকবে।

— স্বাধীনতা কথাটা কত ছোট !

— কেন ?

— তুমি মুসলমান বলে শুধু মুসলমানদের বলতে পারবে — তারা ভুল করছে। হিন্দুদের পারবেনা! আমি দৈবাৎ হিন্দুর ঘরে জন্মেছি — এখন আমি যদি বলতে যাই, মুসলমানদের বোরখা-পরা কিংবা পর্দা-প্রথা খারাপ কিংবা বাঙালি মুসলমানদের নাম কেন বাংলাভাষায় রাখা হয়না, অমনি বলা হবে আমি অনধিকার চর্চা করছি। আমাকে ওরা মারতে আসবে। তুমি যদি আবার বল, হিন্দুদের বিয়ের সময় মেয়েদেখানো-প্রথা কিংবা বিধবাদের ঝিয়ের মতো খাটানো, কিংবা জাতিভেদ-প্রথা খারাপ — তবে তোমার নিস্তার নেই। তাও তো এ-সব সামাজিক প্রথা, ধর্ম নিয়ে তো কথাই বলা যাবেনা। আমি হিন্দুধর্ম সম্পর্কে গুষ্টির পিণ্ডি করে যা-খুশি বলতে পারি, কিন্তু ইসলামের নিন্দে করতে পারবনা। আবার, তুমি ইসলামের দোষত্রুটি দেখাতে পারো, কিন্তু একবার হিন্দুদেব মূর্তি-পূজা নিয়ে কথা বলে দেখ দেখি ! এর নাম স্বাধীনতা, আবদুল ?

— তা হোক ! তবু আমাদের যতটা সাধ্য চেষ্টা করা উচিত।

একটুক্ষণ চুপ করে রইলাম, দুজনেই। তারপর আবদুল গাঢ়স্বরে বলল, 'চলে যাচ্ছি, আর আপনাদের সঙ্গে কখনো দেখা হবে কিনা, কী জানি। মনটা খারাপ লাগছে।'

বললাম, 'চলো, তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।'

সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় যতদূর সম্ভব চেষ্টা করলাম আবদুলকে অন্যমনস্ক করে দেবার, তবু ওর চোখ পড়ে গেল। আমাদের ফ্ল্যাটবাড়ির সিঁড়ির তলায় অন্ধকার জায়গায় একটি পরিবার এসে আশ্রয় নিয়েছে — সেদিকে তাকিয়ে ও জিজ্ঞেস করল, 'এরা কারা? আগে তো দেখিনি।'

বললাম, 'কী জানি, চলো তাড়াতাড়ি, বাস এসে গেছে।'

— ইস্, সিঁড়ির নিচের ঐটুকু জায়গায়, এখানেও ভাড়াটে নাকি?

— জানিনা, চলো চলো।

— বাঃ, এক বাড়িতে আছেন, জানেননা।

— কী জানি লক্ষ করিনি। চলো, আমার একটু তাড়া আছে।

ততক্ষণে আমরা বাড়ির বাইরে এসেছি। আবদুল হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল, 'আপনি যেন কিছু লুকোচ্ছেন!'

— নিজের লজ্জার কথা বলব কী করে? ওরা আমার পিসীমা আর তাঁর ছেলেমেয়ে। নিজের ঘরে জায়গা দিতে পারিনি, সিঁড়ির তলায় আছেন — একথা কি আর সকলকে বলা যায়?

— নীলুদা, আমি দূরে চলে যাচ্ছি শুনে অমনিই আপনি আমাকে পর-পর মনে করছেন। ওরা কোথা থেকে এসেছেন?

— পাকিস্তান থেকে! কিন্তু, আবদুল, তুমি পাকিস্তান চলে যাচ্ছ — সেই সময়ই পাকিস্তান থেকে একটা হিন্দু পরিবারের চলে আসা নিয়ে আলোচনা করা অত্যন্ত ভালগার। আমি চাইনা। এরকম তো চলছে, জানই। সে নিয়ে আর কথা বলে কী হবে?

আবদুলের মুখ মুহূর্তে বিষণ্ণ হয়ে গেল। ওখানে দাঁড়িয়ে থেকেই বলল, 'ওঁরা কেন চলে এলেন? আবার কি কোন গণ্ডগোল শুরু হয়েছে?'

— না।

— আপনি সত্যি কথা বলুন।

— সত্যিই বলছি। আমি বারবার ওদের জিজ্ঞেস করেছি — কোন দাঙ্গা হয়েছে কিনা, কেউ ভয় দেখিয়েছে কিনা — নইলে এতকাল পর কেন চলে এলেন। কিছুই হয়নি। এমনিই। দাঙ্গা হয় সাধারণত শহর-অঞ্চলে। ওঁরা এসেছেন ফরিদপুরের একটা গ্রাম থেকে — সেখানে আমিও জন্মেছি — সেখানে এপর্যন্ত কোনদিন দাঙ্গা হয়নি।

— এমনি কেউ আসেনা। কেন চলে এলেন তবে?

— তুমিও তো এমনিই যাচ্ছ। অস্বস্তি! পিসেমশাই বুড়ো হয়েছেন — ওঁর বড় ছেলেটা মারা গেছে — মুসলমানদের হাতে নয়, কলেরায়। তবু, দেশের

জমিজায়গায় দিন চলে যেত। কিন্তু পিসীমার এক মেয়ে বড় হয়েছে — তার জন্যেই এখানে চলে আসা। কয়েকটা ছোকরা নাকি দিনরাত ঘুরঘুর করত, উড়ো চিঠি দিয়েছে, রাত্তিরবেলা মেয়েকে চুরি করে নিয়ে যাবে বলে শাসিয়েছে। কী এমন অস্বাভাবিক এটা? ওঁরা কি জানেননা যে, সোমথ মেয়েদের পিছনে ছোকরাদের ঘোরাঘুরি এখানেও বেশি ছাড়া কম নয়? তাছাড়া, এই শহরতলি-অঞ্চলের ছোকরারা উড়ো চিঠি না-দিয়ে এমনিতেই মেয়েদের ছিনিয়ে নিয়ে যায়। তবে, এখানে এসে কী লাভ হল, এখানে খাবার সংস্থান নেই, তবু কেন এলেন? কারণ কী জান, সন্দেহ আর অবিশ্বাস। আসবার সময়, গ্রামের অনেক মুসলমান নাকি বলেছে, যাবেননা, আপনারা গ্রামের শেষ ব্রাহ্মণ, আপনারা যাবেননা। তবু কেন এসেছেন? সেই সংখ্যালঘু হবার অপমানবোধ। ভেবেছে দিনদুপুরে মেয়ের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেও গ্রামের একটা লোকও তখন প্রতিবাদ করবেনা। সন্দেহ আর অবিশ্বাস! তুমি যাকে আধুনিক ভাষায় বললে, অস্বস্তি।

১৪

— কী, অমন চেহারা কেন? ঘোড়ার পিঠে চেপে এলেন নাকি?

— হ্যাঁ, ঘোড়ায় চেপে নাচতে-নাচতে এলাম।

— এই ভরদুপুরে?

— আর জি কর হাসপাতালের পাশের রাস্তা দিয়ে ঝসে চেপে এলে সকলকে নাচতেই হবে ভাই। আজ দশ বছর নেচে নেচে অফিসে আসছি।

— তা, রাস্তাটার নাম উদয়শঙ্কর রোড দিয়ে দিন-না।

— দিলাম। আর আমার বাড়ির পাশের রাস্তাটা তাহলে বৈজয়ন্তীমালা লেন!

দুজন লোকের এই কথোপকথন আমাকে শুনতে হল। অনেক অপরিচিত লোকের সম্পূর্ণ অনাবশ্যক কথাবার্তা আমরা শুনতে বাধ্য। কারণ, বাস-ট্রামে-ট্রেনে মুখ বুজে যাওয়া আমাদের স্বভাব নয়। একা থাকলে অপরের কথা না শুনে উপায় নেই। কার পিসশাশুড়ির গেঁটে বাত হয়েছে, কিংবা কার ন কাকিমার আপন ছেলে —না, না— আপন ন কাকিমার ছেলে বিলেত থেকে ফিরেছে কিংবা মন্দিরা নাম্নী কোন্ বালিকা অধ্যাপকের দিকে তাকিয়ে হেসেছে— এইসব শুনে যাই, যতক্ষণ না আমার সঙ্গে কোন বন্ধু জোটে। তখন আমরাই আবার সরবে ঐরকম কোন কথা শুরু করি।

তবে, একটা জিনিশ লক্ষ করেছি, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত চেহারার লোকদের

কাছ থেকে মাঝে-মাঝে দু-একটা চমৎকার রসিকতা শোনা যায়। দেশের অবস্থা যখন খুব বেশি খারাপ, নানান অনটন — রসিকতার মাত্রা তখন বেড়ে যায়। রাগারাগির বদলে হাসাহাসিতেই বাঙালিরা বেশি পারংগম বোধহয়। মাস দুয়েক আগে, বাসে এক ভদ্রলোককে বলতে শুনেছিলাম — তিনি তখনো সর্ষের তেল খান নিজেই সর্ষের ফুল থেকে বানিয়ে। কিন্তু অত সর্ষের ফুলই বা পাচ্ছেন কোথায়? নিজের দুচোখ থেকে। উচ্চাঙ্গের রসিকতা নয়, কিন্তু বলার ভঙ্গি।

ঐরকম ভাবেই এক ডাক্তারের গল্প শুনেছি। ডাক্তারের এক রোগী এসেছে, তার বিষম মাথাধরার অসুখ। কিছুতেই সারছেনা। অনেক চিকিৎসা করা হল। শেষে ডাক্তাব বললেন, 'আপনার ব্রেনটা খুলে রেখে যান, ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে দেখি।' রোগী ভদ্রলোকেব মাথা থেকে সবটুকু ব্রেন খুলে একটা কাচের বাসনে রাখা হল, ডাক্তার তাকে বললেন এক মাস বাদে আসতে। তারপর এক মাস যায়, দুমাস যায রোগী আব আসেনা ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার নিজেই পড়লেন মহা চিন্তায়। লোকটার হল কী? মবেই গেল, না কী হল? আর যদি বেঁচে থাকে, তবে ব্রেন ছাড়া কাজকর্ম করছে কী করে? অথচ লোকটার কোন সন্ধান নেই।

অনেকদিন বাদে ডালহাউসি স্কোয়ারে লোকটিকে দেখতে পেলেন ডাক্তার। গাড়ি থামিয়ে ডাকাডাকি শুরু করে দিলেন, 'ও মশাই, শুনছেন, শুনছেন!' — কাছে এসে ভাবলেশহীন মুখে লোকটি বলল, 'কী ব্যাপাব?'

— আচ্ছা লোক তো আপনি, আর এলেননা? আপনার ব্রেন যে আমার কাছে রযে গেছে।

— থাক। ওটা আর আমাব দবকার নেই। আমি সরকারি অফিসে চাকরি পেয়ে গেছি।

ওডহাউসের অনুকরণ, তা ও ক্ষতি নেই। দুজন লেখক একদিন আমাকে বলেছিলেন, পৃথিবীতে সব রসিকতা শেষ হয়ে গেছে, খাঁটি নতুন রসিকতা নাকি হবার আর উপায় নেই। আমিও একটি বিদেশী প্রবন্ধে পড়েছিলাম, পৃথিবীতে সত্যিকারের নতুন কোন 'গল্প' আর বানানো সম্ভব নয়। এগারো রকমের বেশি প্লট হতে পারেনা। এখন শুধু পরিবেশ নতুন হবে। সেইজন্যেই হয়তো পুরোনো রসিকতায় আর একটি লোককে নতুন করে খুশি হতে দেখলাম। সম্প্রতি বাসের ভাড়া বাড়ায় তিনি দুঃখিত হননি। মহা খুশি হয়ে বন্ধুকে বলছেন, 'আমার ভাই ভালোই হল, আগে হেঁটে অফিসে যাওয়া-আসা করে চব্বিশ নয়া পয়সা বাঁচাতাম, এখন হেঁটে গেলে বাঁচবে তিরিশ পয়সা। বাস ভাড়া আরও বাড়লে আমার ব্যাঙ্কে বহু টাকা জমবে।'

আর-একটি সুন্দর কথা শুনেছিলাম এক বৃদ্ধের মুখে। হাতে একটি দেড়

কিলো রুইমাছ ও কয়েকটি নধর ফুলকপি। একজন জিজ্ঞেস করল, 'কী গণেশ-দা, এই বাজারে অত বড় মাছ ? বাড়িতে মচ্ছব নাকি ?' 'না ভাই, বুড়ো হলাম, ছেলেটাকে চাকরিতে ঢোকাতে হবে তো ! এখন থেকে সাহেবকে নিজের গাছের রুইমাছ আর পুকুরের ফুলকপি না দিলে চলবে কী করে ?'

আর চিড়িয়াখানায় সেই লোকটির চাকরি করার গল্প ? কে না জানে ঐ গল্প। একদিন ট্রামে বসে একজন লোককে ঐ গল্পটিই বলতে শুনে এমন বিরক্ত হচ্ছিলাম। সবচেয়ে খারাপ লাগে জানা-রসিকতা অপরের মুখে শুনতে ? নিজে বার-বার বলতে খুব খারাপ লাগেনা যদিও। কিন্তু গল্পটার শেষ শুনে বুঝলাম, বক্তা একজন সত্যিকারের শিল্পী। পাঠক, ধৈর্য ধবে আর-একবার শুনুন। বক্তা অবশ্য কানাই নামে তার কোন-এক চেনা লোকের নামে গল্পটা চালাচ্ছিলেন। অর্থাৎ কানাই এম. এ. পাশ করেও কোন চাকরি পাচ্ছিলনা। তারপর, তার এক মুরুব্বি তাকে চিড়িয়াখানায় ঢুকিয়ে দিল। চিড়িয়াখানার শিম্পাঞ্জিটা মরে গেছে, তার খাঁচায় শিম্পাঞ্জির ছাল পরে কানাইকে থাকতে হবে। কয়েকদিন বেশ মনোযোগ দিয়ে কাজ করেও কানাই ওপরওলার মন পেলনা। (নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী যে বিষণ্ণ শিম্পাঞ্জিকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন— তা বোধহয় ঐ ছদ্মবেশী কানাইকে দেখেই) ওপরওলা এসে ধমকে কানাইকে বললেন, এরকম মানুষের মতো চুপ করে বসে থাকলে তার চাকরি যাবে। সুতরাং তারপব থেকে দর্শক এলেই নেচে-কুঁদে কানাই খুব খেলা দেখাতে লাগল। তার ধরে ঝুলে ডিগবাজি খেয়ে তার কসরত হল দেখবার মতো। শেষে একদিন দর্শকদেব মধ্যে দেখতে পেল ওর কলেজের সহপাঠিনী অরুণা সান্যালকে। কোনদিন অরুণার মন পায়নি কানাই। আজ তাকে খুশি করাব জন্য শিম্পাঞ্জি-বেশী কানাই মহা লম্ফঝম্প জুড়ে দিল। তারপর একবার হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় গিয়ে পড়ল পাশের খাঁচায়। সে খাঁচাটা বাঘেব। বাঘ খাঁটি হালুম গর্জন করে এক লাফে এসে পড়ল ভয়ে আধ-মরা কানাইয়ের কাছে। তক্ষুনি তাকে না খেয়ে ভালো করে শুঁকে দেখতে লাগল। তারপর কানাইয়ের কানের কাছে মুখ এনে বাঘ বলল, 'ভয় নেই দাদা, আমিও বাংলার এম.এ.।'

১৫

এমনসময় ধাক্কা লাগল। ল্যান্ডো গাড়িটা দিশাহারা হয়ে প্রথমে সবগুলো চাকা বেঁকে, — সেইসময় প্রবল হায়-হায় ধ্বনি জনতার — পিছন দিকে গড়িয়ে যেতে

লাগল বেগে, আর ঐ প্রবল, তেজী, দৃপ্ত বেগবান পুরুষ অশ্ব সেই টানে পিছিয়ে যাচ্ছে, সামনের দুটি পা শূন্যে তুলে থামাবার চেষ্টা করল পিছিয়ে যাওয়া গতি। পারলনা। কোচোয়ান আগেই মাটিতে পড়ে গেছে। চি-হিঁ-হিঁ আর্তকণ্ঠ না আক্রোশের হুংকার কী জানি। অমন শক্তিমান ঘোড়া, পিছনের দুই পা ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সর্বশক্তি দিয়েও রুখতে পারলনা নিজেকে বা গাড়িটা। চিৎ হয়ে পড়ে গেল। তৎক্ষণাৎ ওর চারপাশে মানুষের গোল বৃত্ত।

আমি দোতলার জানালা দিয়ে দেখছিলাম। বৃষ্টি না-হওয়া মেঘের কোমল ছায়ায় চমৎকার সন্ধেবেলা দোতলা বাসের জানালার পাশে বসতে পাওয়ার গর্বে আমি বাসের মানুষদের দিকে আর একবারও তাকাইনি। টিকিটের পয়সা হাতে নিয়ে বাঁ-হাত বাড়িয়েছিলাম অবহেলায়। যেন ওজন্য আমাকে বিরক্ত না-করা হয়। আমি সর্বক্ষণ বাইরে তাকিয়ে ছিলাম। তাকিয়ে মেঘ দেখছিলামনা অবশ্য, মেঘে ক্বারুর মুখের ছায়া না-ভাসলে বেশিক্ষণ দেখাও যায়না, আমি নিচের দিকে তাকিয়ে খানিকটা করুণার দৃষ্টিতে মন্থর মানুষের স্রোত দেখছিলাম।

সেইসময় ঘোড়ার গাড়িটা আমার চোখে পড়ে। ল্যান্ডো বা টমটম কী বলে ওগুলোকে আমি ঠিক জানিনা, এক-ঘোড়ার গাড়ি, গাড়ির রং মসৃণ চকচকে কালো, ঘোড়ার রং সাদা — পুরো সাদা নয়, শিরদাঁড়াব্যাপী লালচে প্যাচ, কোচোয়ানের মাথায় মুরেঠা, তকমা-আঁটা পোশাকে পিছনে দাঁড়িয়ে হুঁসিয়ার-দার। উত্তর কলকাতার দু-একটি বনেদী বাড়িতে এখনো কয়েকটি এরকম গাড়ি আছে জানি, কিন্তু সহসা চোখে পড়েনা, এ গাড়িটাকে দেখে মনে হয় যেন অকস্মাৎ ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে উঠে এল।

গাড়িটা দেখার সঙ্গে-সঙ্গেই আমার প্রবল ইচ্ছে হল, গাড়িটার মধ্যে যিনি বা যাঁরা আছেন তাঁদের দেখার জন্য। এইসব অভিমানী, পরাজিত তবু মুখে অহংকারের হাসি-ফোটানো মানুষদের দেখতে এখনো খুব কৌতূহল হয়। বনেদীবাড়িগুলো থেকে এইসব জুড়িগাড়ির চল বন্ধ হতে শুরু করে মোটরগাড়ি আসবার পর — এখন অবশ্য, সেসব বাড়ির অনেকেরই আর জুড়ি বা মোটর কোনটা রাখারই সামর্থ্য নেই। মনে আছে, একবার আমি আমার এক বন্ধুর বাড়ির অন্দরমহলের শয়নঘরে গিয়েছিলাম। বন্ধুটির পূর্বপুরুষ কলকাতার অভিজাত সমাজের একজন ছিলেন। ওদের রং-জ্বলা কুৎসিত বিরাট বাড়িটির খিলান ও মণ্ডপ, ধুলোয় ঢাকা ঝাড়লণ্ঠন দেখলে কিছুটা আঁচ পাওয়া যায়। কিন্তু দেখেছিলাম, বন্ধুটির মা রান্না করছিলেন একটা বেনারসি শাড়ি পরে। পুরোনো খাঁটি, ভারি চমৎকার, অত্যন্ত দামি শাড়ি — কিন্তু ওর মাকে রান্নাঘরে দেখে সেই মুহূর্তে বুঝতে পেরেছিলাম, ওদের দারিদ্র্য কত নৃশংস জায়গায় এসেছে, দারিদ্র্যের এমন বীভৎস

রূপ আমি শিয়ালদার ফুটপাথে মরে-থাকা ভিখারির মধ্যেও দেখিনি। বন্ধুর মা আমাকে দেখে কিছুটা যেন অপ্রস্তুত হয়েছিলেন, পায়ে হাত দিয়ে যখন প্রণাম করি, তিনি আশীর্বাদ করার সময় একটু হেসেছিলেন, চাপা বিষাদময় ক্রুদ্ধ অভিমানের হাসি।

ল্যান্ডোর আরোহীদের সহজে দেখতে পাইনি। পর্দা ফেলা ছিলনা, কিন্তু ঘোড়াটা দুলকি চালে ছোটার বদলে বেশ জোরে দৌড়োচ্ছিল। কখনো ডবল-ডেকারের পাশাপাশি আসেনি। ভালো জাতের, বোধহয় একেই ওয়েলার ঘোড়া বলে, ঘোড়াটার মধ্যে যেন পাল্লা দেবার স্পৃহা এসেছিল। মাঝে-মাঝে আমাদের বিরাট দৈত্যের মতন বাস হুস করে ওকে পেরিয়ে বহুদূর এগিয়ে যাচ্ছে, ঘোড়াটা তখন গ্রীবা ফিরিয়ে দেখছে। আবার স্টপে এসে বাস থামার সময় লোকের ভিড়, জেনানাদের ওঠা-নামার অবকাশে টক্ টক টক্ শব্দে ঘোড়ার গাড়ি আমাদের পেরিয়ে যাচ্ছে, ঘোড়াটা তখন আর অবহেলায় বাসের দিকে চেয়েও দেখছেনা। একবার কী-একটা কারণে পথ আটক, বাস ও ল্যান্ডো দুটোই থামল, ঘোড়াটার থেমে থাকা যদিও পছন্দ নয় — অসহিষ্ণুভাবে মাটিতে পা ঠুকছে। তখন আমি আরোহীদের দেখতে পেয়েছিলাম।

একটি নবীনা নারী ও একজন প্রবীণ পুরুষ। দুজনের বয়সের ব্যবধান অন্তত পঁচিশ। অর্থাৎ মেয়েটির বয়েস কুড়ি থেকে পঁচিশ হলে, পুরুষটি পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ। যে-রকম হয়, দুজনেই অত্যন্ত গৌর বর্ণের, সুকুমার স্বাস্থ্য, মেয়েটি সেই জাতের সুন্দরী যাদের মুখ বিনা প্রসাধনেও অত্যন্ত উজ্জ্বল দেখায়, ওর চোখ দুটি নিশ্চিত লক্ষণ সেনের কাটা দিঘির জলের মতো কালো ও গভীর — আমি ভালো করে না দেখতে পেয়েও বুঝেছিলাম।

মানুষের স্বভাবই এই, সকলেরই কিনা জানিনা, অন্তত আমার — কোনও অচেনা নারী-পুরুষ একসঙ্গে দেখলেই তাদের সম্পর্কটা মনে-মনে ভাবা। বাক দত্ত-দত্তা, প্রেমিক-প্রেমিকা, দিদির বর ও স্ত্রীর বোন, স্বামীর বন্ধু ও বন্ধুপত্নী, দাদার বন্ধু ও বন্ধুর বোন, দুই শত্রুপক্ষ অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী ইত্যাদি, এসব জানার আমার কোনও দরকার নেই, একটি যুগলকে এই কয়েক মিনিট দেখছি আর হয়তো জীবনে দেখবনা — ওদের সম্পর্ক জেনে কী লাভ আমার, তবু মন এসব যুক্তি মানেনা, মাথার মধ্যে আন্দাজের পাশাখেলা চলে। মোটরগাড়ির যাত্রীদের দেখে আন্দাজ করা খুব শক্তও নয়, গাড়ি বা ট্যাক্সিতে দুজন নারী-পুরুষ যখন কঠিন মুখে দুজন দুদিকে চোখ ফিরিয়ে বসে থাকে, তখন নিশ্চিত বোঝা যায় ওরা স্বামী-স্ত্রী, একটু ঘনিষ্ঠ, পথচারীদের সম্বন্ধে উদাসীন, কিছুটা বিসদৃশভাবে বসে-থাকা যুগল দেখলে গোপন সম্পর্কের কথা মনে আসে।

কিন্তু এদের দেখে কিছুই বোঝা যায়না। এরা ঠিক কঠিন মুখে নয়, কিন্তু চাপা রাশভারী গাম্ভীর্য নিয়ে এবং হেলান দিয়ে নয়, দুজনেই উন্নতদেহে বসে আছে। যেন পথ চলতে প্রগল্‌ভতা, কথা বলা, ওদের মানায়না। ওরা পিতা-পুত্রী, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী যা-কিছু হতে পারে।

বাধা সরে যেতেই আবার গাড়ি চলতে আরম্ভ করল। অসহিষ্ণু ঘোড়াটা এবার ছুটতে লাগল খুব জোরে। যেন এবার আর কিছুতেই সে ডবল-ডেকারকে এগিয়ে যেতে দেবেনা। এবারই সত্যিকারের প্রতিযোগিতা, কেউ হ্যান্ডিকাপ পায়নি, একই খড়ির দাগ থেকে দৌড় শুরু করেছে। ঘোড়াটার জন্য আমার মায়া হল, অমন সুন্দর জন্তুটা — ঘোড়ার মতো সুন্দর প্রাণী আর বোধহয় পৃথিবীতে একটিও নেই —যার শরীরে প্রতিটি অঙ্গ সুষম, অমন সুন্দর জন্তুটা হেরে যাবার দুঃখ পাবে! মনে-মনে ভাবলাম, হেরে গেলেও তোর দুঃখ নেই রে, মরে গেলেও তুই গতির প্রতীক হিশেবে বেঁচে থাকবি চিরকাল, এই ডবল-ডেকারও বোধহয় হর্স-পাওয়ার দিয়ে মাপা। ঘোড়াটা তবু জেতার দারুণ চেষ্টায় ছুটছিল। সামনেই ট্রাফিকের লাল আলো, বাস আস্তে-আস্তে থেমে গেল, ঘোড়াটা লাল আলো মাননলা, কী জানি কোচোয়ান থামাবার চেষ্টা করেছিল কিনা, ছুটে এগিয়ে গেল।

এমনসময় ধাক্কা লাগল। ক্রস রোড থেকে আরেকটা ডবল-ডেকার, ঘোড়ার চি-হিঁ-হিঁ-র চেয়েও তীব্র যান্ত্রিক শব্দ উঠেছিল বাসের ব্রেক কষার। আমরা স্পষ্ট দেখলাম দৃশ্যটা। ধাক্কা যেন লাগেইনি প্রায়, শেষমুহূর্তে ব্রেক কষে বাস থামার আগে ল্যান্ডো গাড়িটাকে যেন শুধু আলতোভাবে কোণাকুণি ছুঁয়ে দিল। তাতেই গাড়িটা ঝাঁকানি দিয়ে বেঁকে জোরে পিছিয়ে আসতে লাগল, ঘোড়াকে পিছন দিকে টেনে কোচোয়ান নিচে পড়ে গেছে, ঘোড়াটা অসহায়ভাবে দু-পা তুলে দাঁড়িয়ে পড়েও থামতে পারলনা, পিছিয়ে আসতে-আসতে চিৎ হয়ে পড়ে গেল। ঘোড়া কি জীবনে পিছু হটেছে, অভ্যেস নেই, পড়ে তো যাবেই। যাক, দুর্ঘটনা সামান্য।

আমি তৎক্ষণাৎ পথে নেমে এসেছিলাম। কীজন্য ঠিক জানিনা। দেখা গেল একজন মানুষেরও প্রাণ যায়নি, পিছনের লোকটি আগেই লাফিয়ে নেমে গিয়েছিল, কোচোয়ান ওপর থেকে পড়ে গেলেও শুধু মাথা ফেটেছে, রক্তাক্ত মুখ — কিন্তু জ্ঞান আছে, সুতরাং প্রাণের ভয় নেই। প্রৌঢ় ও যুবতীটি গাড়ি থেকে নেমে পাশাপাশি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন, প্রৌঢ়ের একটি হাত থুতনিতে রুমাল চেপে ধরা, যুবতীটি অক্ষত, আগেরই মতো শান্ত। শুধু ঘোড়াটা চিৎ হয়ে ছটফট করছে, ওঠার সাধ্য নেই।

মানুষের যদিও দুটি চোখ, কিন্তু একই সঙ্গে দুচোখে দুপাশের দুটি দৃশ্য দেখা সম্ভব নয়। কিন্তু আমি কী করে দেখেছিলাম জানিনা — একই সঙ্গে আমি ঐ শান্ত

যুবতী ও মুমূর্ষু ঘোড়াকে দেখেছিলাম প্রতিমুহূর্ত। এমন একটা কাণ্ডের পরও কী করে অমন অবিচলিত, শান্ত হয়ে ছিল, একটুও ব্যস্ত হয়নি, উত্তেজিত হয়নি — স্থির চোখে মেয়েটি দেখছিল অত বড় জন্তুটার মৃত্যুর ছটফটানি। মেয়েটি এমন কিছু অসাধারণ নয়, সাধারণ সুন্দরী নারী — এমনকী ওর মাথার কাছে সিনেমার পোস্টারে যে নায়িকার মুখচ্ছবি আকা ছিল — তার কাছে সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় এ মেয়েটি নিশ্চয়ই হেরে যাবে — তবু অমন কমনীয় গাম্ভীর্য ও পেল কোথায়, কী করে নির্নিমেষে দেখতে পেরেছিল একটা পুরুষ প্রাণীর মৃত্যু? মেয়েটি এমনভাবে দাড়িয়েছিল — যেন কলকাতার কোনও পথে আগে সে কখনো দাঁড়িয়ে থাকেনি এতগুলো চোখের সামনে — এবং এরকমভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যে ওকে মানায়না — সে-সম্বন্ধে ও পূর্ণ সচেতন।

আর ঘোড়াটা মহাকাব্যের করুণতম দৃশ্যের সৃষ্টি করেছিল। ঐ বলশালী, বিশাল, জোয়ান অশ্ব চিৎ হয়ে পড়ে প্রাণপণে চেষ্টা করছে উঠে দাঁড়াবার। মুখে বল্গা, চামড়ার ফিতের জটের মধ্যে আটকে থেকে ছিঁড়ে উঠে দাড়াবার প্রয়াস, প্রকাণ্ড সাদা পেটটা যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাচ্ছে, বিশাল চোখ ঘুরছে অসহায়, বিহ্বল, প্রবল ত্রাসে। ঘোড়া কোনদিন বসেনা, শোয়না, চিৎ হয়ে পড়া মানে তো নিশ্চিত মৃত্যু। এমনভাবে পা ছুঁড়ছে যে, কারুর সাহস নেই ওকে তুলে দেবার চেষ্টা করে।

হঠাৎ আমার মনে হল, এই যেন কলকাতার শেষ ল্যান্ডো গাড়ির শেষ ঘোড়া। অবলুপ্তির আগে আরেকবার শেষ চেষ্টা করছে উঠে দাড়াবার। ওর সুদৃশ্য দেহের বলবান পেশীগুলো ফুলে-ফুলে উঠছে চেষ্টায়। পারবেনা, তা তো জানিই, কিন্তু এত পায়-হাটা মানুষের ভিড়ের মধ্যে ওর ঐ পতন, মৃত্যুর চেয়েও করুণ। ঘোড়াটার মুখ দিয়ে সাদা গেঁজলা বেরিয়ে শরীর নিথর হয়ে গেল।

একটাও মানুষ মরেনি শুধু নিতান্ত একটা ঘোড়া, এ খবর জেনে নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে ছত্রভঙ্গ হল কৌতূহলী জনতা।

১৬

এমন গ্রীষ্মে এত অসংখ্য ফুল ফুটল কেন এ-কলকাতায়? যেখানে যে-কোন সবুজের অস্তিত্ব আছে, এরণ্ড কিংবা মহাদ্রুম, প্রত্যেক সবুজের সঙ্গেই অন্য-একটা রঙের ফুল ফুটেছে, এমনকী, ময়দানের ঘাসেও ফুটেছে ঘাসফুল। এত ফুলের বাহার দেখে, হঠাৎ আমার অনুতাপ হল, কেন আমি সব ফুলের নাম জেনে রাখিনি আগে। নাম না-জেনে ফুলকে আদর করা যায়না। শেকসপীয়র ভুল বলেছিলেন,

কিংবা অনেক বদলে গেছে ফুল ও মেয়েরা, মেয়েদেব যে-কোন নামে ডাকা যায়, বিয়ের পব তো সব মেয়েবই নাম বদলে যায়, অনেকসময় ডাকনামও, কিন্তু গোলাপকে চামেলি নামে ডাকা কে সহ্য কববে? 'গন্ধবাজ' শুনলেই যেমন অন্ধকাবে পাতাব আড়ালে লুকানো রাজমুকুটের মতো সেই ফুলটি চোখে ভাসে, ওকে আব অন্য নামে ডাকা সম্ভব? 'বজনীগন্ধা' নামটা কোথাও উচ্চাবিত হলে, কেন জানিনা, আমাব তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে, আবাকানেব পাহাড়ে-পাহাড়ে পলাতক সুজাব কোন-এক যুবতী কন্যাব শবীব। খুব স্পষ্ট মনে পড়ে, যেন গত বছরেব স্মৃতি। যেমন ভাটফুল। ঐ নামেব ফুল আমি কখনও চোখে দেখিনি কিংবা দেখলেও চিনিনা, কিন্তু কী জোবালো নাম। শুনলেই শবীব কাঁপে। আমি নিশ্চিত জানি, যেদিন আমি প্রথম ভাটফুল দেখব, আমাকে নতজানু হযে বসে ক্ষমা প্রার্থনা কবতে হবে। দোতলা বাসে যেতে-যেতে মযদানের একটা উঁচু গাছেব মাথায ঝাক ঝাক বসে থাকা হলুদ ফুল দেখলাম। ও ফুলগুলোব নাম কী? কে যেন বলল, বাধাচূড়া। সবসময়ই কৃষ্ণচূড়া ফুলেব গাছেব উল্টোদিকে বাধাচূড়াব গাছ থাকে। কিন্তু যতক্ষণ-না এ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পাবছি, ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ হলদে ফুলগুলোকে পুবোপুবি তাবিফ কবতে পাবছিনা। ফুলেব নামেব মূল্য অনেক।

আমাব বন্ধু সমীব আমাকে বিপদে ফেলে গেল। চৌবাস্তাব মুখে দাড়িযে কিছুক্ষণ কথা বলছিলাম, ওব হাতে দুটো চাপা ফুল ছিল। একবাব অন্যমনস্কভাবে ওব হাত থেকে ফুলদুটো একটু নিতেই, সঙ্গে-সঙ্গে ও বলল, 'ফুলদুটো তোমাকে দিলাম।' তাবপব আমাকে প্রতিবাদ কবাব বিন্দুমাত্র সুযোগ না-দিযে — আচমকা কোন মানুষকে ধাক্কা দিযে জলে ফেলে পালিযে যাবাব মতো, ও ছুটে গিযে একটা চলন্ত ট্রামে উঠে অদৃশ্য হযে গেল। আমি অসহায ও বিমূঢ়ভাবে দাড়িযে বইলাম। হাতে চাপা ফুলদুটো। চাপা ফুল! ভাবতেও শবীব শিউরে ওঠে, এ-ফুল আমি হাতে বেখে কী কবব? অথচ আমাব পকেটেব অন্ধকাবে সিগাবেটেব প্যাকেটেব পাশাপাশি, কিংবা রুমালেব সহবাসে এ ফুল বাখাব নয়। আমাব হাতে দুটো চাপা ফুল নিযে আমি সাবা বাস্তা ঘুববব, এ দৃশ্য আমাব কাছেই কল্পনাতীত। ফুল হাতে বাখাব নয়, অন্য কাউকে দিযে দেবাব। সমীব বোধহয এ ফুল দেবাব মতো কাউকে পাযনি, তাই আমাব হাতে তুলে দিযেই লজ্জায় দ্রুত ছুটে পালাল। কিন্তু, আমি কাকে দেব এই ফুল? তাছাড়া, আমাব হাতে ফুল থাকা বেশিক্ষণ নিবাপদ নয়।

এখানে ফুল সম্পর্কে আমাব একটি অত্যন্ত কুস্বভাব ব্যক্ত কবি। আমি ফুল হাতে বাখা পছন্দ করিনা। গাছ-টাছে ফুটে থাকলে বেশ ভালোই লাগে, কিন্তু হাতে নিলেই আমি তৎক্ষণাৎ মানুষেব মতো হযে যাই। অর্থাৎ অত্যন্ত লোভ

হয়। কোন ফুল দেখে হঠাৎ খুব ভালো লাগলে আমার খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করে। আমি অনেক ফুল খেয়েছি। ফুল-খাওয়া দেখলে অনেকে চটে যায়। কী আশ্চর্য! যেন আমি মানুষ খুন করছি। কেউ-কেউ বলে, ফুল নাকি বিষাক্ত হতে পারে। তারা নাস্তিক। আমি কোন দ্বীপে গিয়ে 'লোটোস' নামের ফুল খেয়ে দেখিনি, কিন্তু, জবা কিংবা গন্ধরাজ, গ্যাঁদা কিংবা গোলাপ আমি খেয়ে দেখেছি, এমনকি পদ্মফুল, পোস্তফুলও, ওরা সবাই নিষ্পাপ। ফুলটাকে না-খেয়ে শুধু গন্ধ শুঁকে বাহবা দেওয়া কীরকম অস্বাভাবিক লাগে আমার কাছে। ডলুমাসির বাড়িতে গিয়েছিলাম, নিউ আলিপুরে জাপানি কায়দায় চমৎকার বাড়ি করেছেন, আমাকে করিডরের সারি-সারি টবে ফুল দেখাচ্ছিলেন। জিনিয়ার সঙ্গে সন্ধ্যামালতীর ব্রিড করিয়ে উনি একটা হাল্কা রঙের নতুন ফুল তৈরি করেছেন। আমি দেখে এত অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম যে নিচু হয়ে ঝুঁকে গন্ধ শোঁকার ছলে একটা পাপড়ি দাঁত দিয়ে কেটে চিবিয়ে দেখলাম। ডলুমাসি এমন আঁতকে উঠলেন, বাড়ির সব লোকজনকে ডেকে এমন-একটা দৃশ্যের অবতারণা করলেন যে, বিরক্ত হয়ে আমি ও-বাড়িতে আর যাওয়াই ছেড়ে দিয়েছি!

সেই থেকে খানিকটা সজাগও হয়েছি অবশ্য। এই চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে আমি যদি চাঁপা ফুলদুটো কচকচ করে চিবিয়ে খাই এখন, তবে এখুনি আমায় হয়তো এক হাজার লোক ঘিরে ধরবে। ভাবতেও আমার পিঠ শিরশির করে উঠল অথচ ইচ্ছেও করতে লাগল খুব। স্বাধীনভাবে শিল্প-চর্চা করার কত বাধা! দুনিয়াটাই ফিলিস্টিনে ভর্তি।

তবু আমি নোখ দিয়ে একটা পাপড়ির কোণ ছিঁড়ে মুখে দিয়ে দেখলাম। নিখুঁত। তৎক্ষণাৎ আমার মনে হল, এ-ফুল নিশ্চয়ই উর্বশী চাঁপা। ফুলের শ্রেষ্ঠ চাঁপা, চাঁপার শ্রেষ্ঠ উর্বশী চাঁপা। দেখেই একটু মনে হয়েছিল। উর্বশীর মতোই এ-চাঁপার গায়ের রং, উর্বশীর বাঁ হাতের মাঝখানের আঙুলের মতো এর গড়ন।

উর্বশী চাঁপা আমাকে প্রথমে চিনিয়েছিলেন ডি কে। সিগনেট প্রেসের দিলীপকুমার গুপ্ত যখন এলগিন রোডে থাকতেন, ওঁদের বাড়ির পাশে ছিল একটা বিরাট চাঁপা ফুলের গাছ। চাঁপা ফুলের অত বড় গাছ আগে কখনো দেখিনি. বাড়ির মাথা ছাড়িয়ে ওপরে উঠে গেছে। ও-গাছটায় বারোমাস ফুল ফুটত। সব গাছেরই ফুল ফোটার একটা নির্দিষ্ট ঋতু আছে, কিন্তু এক-একটা চাঁপা ফুলগাছ চিরযৌবনা। সারাবছরই ফুল ফোটায়, উর্বশীর মতোই ভালোবাসার দিনক্ষণ মানেনা। ডি কে আমাদের মাঝে-মাঝে সেই ফুল দিতেন, আমি খেয়ে দেখেছি, ও-রকম স্বাদ অন্য ফুলে জীবনে পাইনি কখনও।

কিন্তু, এখন এই দুটো ফুল নিয়ে আমি কী করব? তামাকের গুঁড়োর সঙ্গে

মিশিয়ে ওদের আমি পকেটে রাখতে পারিনা। আবার বেশিক্ষণ হাতে রাখার ধৈর্য নেই। হাতে নিয়েই-বা কোথায় যাব ? কাকে দেব ? এই ফুল কোন মেয়ের হাতে তুলে দেবার মতো সর্বনেশে কথা আমি চিন্তাও করতে পারিনা। কোন নারীর কাছে গিয়ে আমি বলতে পারি, নাও, তুমিই এই ফুলের যোগ্য ! মেয়েরা ফুল সহ্য করতে পারেনা, কিংবা ফুলের যোগ্যতা। আমি হর্টিকালচারল গার্ডেনে ফুলের প্রদর্শনী দেখতে প্রতিবার যাই। ওখানে অনেক মেয়ে তাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সাজসজ্জা করে আসে। আমি ঠিক কাদের দেখতে যাই, নিঃসন্দেহে জানিনা। তবে ঐ ফুলের বাগানে আমি সজ্জিত মেয়েদের শত-শত দুঃখিত মুখ দেখেছি। ঈর্ষার দুঃখ। সঙ্গী পুরুষরা যখন রক্তগোলাপের ঝাড়ের দিকে উৎসুক মুখে চেয়ে থাকে, তখন দেখেছি মেয়েদের মুখে অন্যমনস্ক ঈর্ষা। ওরা সেই ফুলের পাশে কতখানি যোগ্য এই দ্বিধা। মেয়েদের হাতে যখন কেউ কোন ফুল তুলে দেয়, তখন আমি লক্ষ করেছি সেইসব মেয়েদের মুখ। মুহূর্তে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, মুখগুলি ক্ষণকালের জন্য চলে যায় ভুলস্বর্গে। ভাবে, দাতা বুঝি কুসুমের বদলে গ্রহিতাকেই বিজয়িনী করল।

যাক, কিন্তু আমি ফুলদুটো নিয়ে কী করব? চেনা মেয়েদের কথা দূরে থাক, পথের যে-কোন সুন্দরী মেয়েকে হঠাৎ ডেকেও আমি ফুলদুটো দিতে পারিনা? দিয়ে বলতে পারিনা, এই নিন, এ-শুধু আপনার সৌন্দর্যের প্রতি নির্লোভ স্তুতি। এ-দেশে ওরকম নীতি নেই। স্তুতি জিনিশটাকে আজকাল আর কেউ নির্লোভ ভাবেনা। সেইজন্যই তো কবিদের আর স্থান নেই এ-সমাজে।

শেষপর্যন্ত আমি বিরক্ত হয়ে উঠতে লাগলাম, ফুলদুটো নিয়ে একি ঝঞ্ঝাট! এই দুটো সুগন্ধ ফুল আমার সন্ধেবেলাটা নষ্ট করে দিচ্ছে, আমি এতক্ষণ চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছি স্থাণুর মতো। কী করব এদের নিয়ে, না-জেনে। শেষপর্যন্ত কি ফুলদুটো শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হবে? ঠিক করলাম, খুন করব ওদের। কুসুমহত্যায় নারীহত্যার অপরাধ নেই। ইচ্ছে হল, নির্মম আঙুলে ওদের ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে ফেলি। কিন্তু এমন রাগ চড়তে লাগল আমার, মনে হল ঐ শাস্তিও যথেষ্ট নয়। তখন ঠিক করলাম, ওদের ট্রামলাইনের ওপর ফেলে দেব, তারপর পর-পর ট্রাম এসে ওদের থেঁৎলে দেবে — সেটা আমি চোখের সামনে দাঁড়িয়ে দেখব। আমি রাস্তার এ-পাশে দাঁড়িয়ে ফুলদুটোকে দূরের ট্রামলাইনের দিকে ছুঁড়ে দিলাম।

ঘটনা গল্পের চেয়েও সাংঘাতিক হয়। হুস করে একটা কালো মোটরগাড়ি এল মাঝপথে, ফুলদুটো গাড়ির জানালা দিয়ে গিয়ে পড়ল একটি মেয়ের কোলে। আমি ভয় ও লজ্জায় সরু হয়ে গেলাম। আমি ফুল খেতে পারি, কিন্তু অচেনা

মেয়ের গায়ে ফুল ছুঁড়ে দেবার মতো রোম্যান্টিক কু-কীর্তি করা আমার স্বপ্নের অতীত। সম্পূর্ণ আকস্মিক এই কাণ্ড। গাড়িটা একটু দূরে গিয়েই থেমে গেল। আমি চোরের মতো সরে গিয়ে গ্যাসপোস্টের আড়ালে লুকোলাম। মনে-মনে তখন আমি হাতজোড় করে আছি। কিন্তু এগিয়ে গিয়ে ক্ষমা চাইবার ইচ্ছে হলনা, বা সাহস।

গাড়িটা একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর দরজা খুলে একটি মেয়ে বেরিয়ে এল, আহা, কী রূপ মেয়েটির, সরল দীর্ঘ শরীর বাটিকের-কাজ-করা সিল্কের শাড়ি-পরা, কালো কোঁকড়া চুলের মধ্যে যেন গন্ধরাজ ফুলের মতন মুখখানা ফুটে আছে। মেয়েটি এদিকে এগিয়ে এল। তারপর গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল একটি যুবা। এর রূপেরও তুলনা নেই — আখরদের মতো দেহ, কিন্তু কমনীয়, সাহেবি পোশাক-পরা, দাড়ি কামাবার পর ফর্সা মুখে নীলচে আভা পড়েছে। দেখে আমার চোখ জুড়িয়ে গেল, এরকম সুসদৃশ জুটি কদাচিৎ চোখে পড়ে। এরকম যৌবনবন্ত দম্পতি দেখলে সত্যিই আনন্দ হয়। এদের উচিত নয় আমাকে রাগ করে শাস্তি দেওয়া। ওরা যেমন মনের সুখে যাচ্ছিল, তেমনিই চলে যাক-না মনের সুখে। দুটো ফুল আর কী বিঘ্ন ঘটাবে।

ছেলেটি দ্রুত এসে মেয়েটির বাহু ছুঁয়ে বলল, 'আঃ সুনন্দা, এসো, গাড়িতে ফিরে এসো, কী দরকার।'

— দাঁড়াও, একবার দেখে যাই, লক্ষ্মীটি।

— কাকে?

— আমি জানি কে ফুল ছুড়েছে।

হঠাৎ পুরুষটি মেয়েটির বাহু থেকে নিজের হাত সরিয়ে নিয়ে গাঢ় স্বরে বলল, 'তুমি তাহলে আজও অজয়কে ভুলতে পারনি?'

মেয়েটি অসহায়ভাবে বলল, 'একটু দাঁড়াও। রাগ কোরো না। একবার অন্তত দেখা করে যাই। এখানেই কোথাও নিশ্চয়ই লুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একবার শুধু।...'

মেয়েটি আকুলভাবে তাকাল এদিক-ওদিক। যুবকটি মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। ওদের দেখে, হঠাৎ আমি বুঝতে পারলাম, ওরকম অসুখী মুখ আমি আর জীবনে দেখিনি। জানতাম উর্বশী চাপা সর্বনাশিনী।

১৭

নিউমার্কেটে অনেকে যায় রকমারি মনোহারী জিনিশপত্র দেখেশুনে কিনতে। আবার কেউ-কেউ যায় — যারা কিনতে এসেছে, তাদের দেখতে। আমার বন্ধু হরিশ ঐ দ্বিতীয়দলের। হাওড়ার দিকে একটা ইস্কুলে পড়ায় হরিশ, থাকে ঐ দিকেই। কিন্তু প্রত্যেকদিন সন্ধেবেলা তাকে চৌরঙ্গি এলাকায় দেখা যাবে। বিলিতি সিনেমা-হলগুলির সামনে — কোনটার কখন শো ভাঙে তার মুখস্থ, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে, যেন কাকে খুঁজছে — অথবা কেউ আসবে ওর জন্য — এমন প্রতীক্ষার মুখে তাকায় চৌদিকে — তারপর যখন সকলেই ঢুকে যায় হলের মধ্যে — ও তখন ছোট্ট একটু হেসে এগিয়ে যায়। শূন্য পায় ঘুরতে-ঘুরতে নিউমার্কেটের মধ্যে যায়, বারবার চক্কর দেয়, গভীর মনোযোগ দিয়ে হাস্যোজ্জ্বল মুখগুলি দেখে, প্রত্যেকটি মুখ, এমন অধ্যবসায় ওর যে কোন দোকানের মধ্যে ঢুকে যে তরুণী মহিলাটি অনেকক্ষণ ধরে কিছু কেনাকেটা করছেন — যার শুধু পিঠটুকু দেখা যাচ্ছে — আমাদের হরিশ কোন ছুতোয় গ্লাসকেসের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে সেখানে, সেই মহিলাটির মুখ না-দেখা পর্যন্ত নড়েনা। ততক্ষণে সিনেমা-হলগুলিতে ইন্টারভ্যাল শুরু হয়েছে, সুতরাং ব্যস্ত হয়ে হরিশ আবার বেরিয়ে যায়, ভিড়ের মধ্যে মিশে একটা সিগারেট ধরিয়ে এমন ঘন-ঘন টানতে থাকে যে মনে হবে হরিশও হল থেকে বেরিয়েছে ইন্টারভ্যালে, সিগারেট শেষ করেই আবার ঢুকে যাবে। তারপর দমকা ঝড়ে সবকটা শুকনো পাতা উড়ে যাবার মতো ঘণ্টা শুনে টিকিট-কাটা নারী-পুরুষেরা এক মুহূর্তে উধাও হয়ে যাবার পর — সম্পূর্ণ ফাঁকা আলো-ঝলমল প্রবেশপথে একা দাঁড়িয়ে থাকে হরিশ। একটু পরে আস্তে-আস্তে বাসস্টপে এসে অনেকগুলো বাস ছেড়ে দেয়। বেশ আসক্ত এবং প্রীতিভরা চোখে পথের বিশেষ-বিশেষ চলন্ত মূর্তিকে খুঁটিয়ে দেখে —। একসময় বাস ধরে বেশ খুশি মনে বাড়ি ফিরে যায়। ভুলেও কোনদিনও কোন সিনেমা-হলের ভেতরে ঢোকেনি, নিউমার্কেট থেকে একটিও জিনিশ কেনেনি আজ পর্যন্ত।

পর-পর তিনদিন হরিশের সঙ্গে আমার একই জায়গায় একই সময়ে দেখা হবার পর জিজ্ঞেস করলাম, 'কী রে, তুই এখানে রোজ কী করিস?'

— বেড়াতে আসি।

— শালকের ছুতোর পট্টি থেকে তুই রোজ চৌরঙ্গিতে বেড়াতে আসিস?

হরিশের বয়েস প্রায় তিরিশ, দোহারা ছিপছিপে চেহারা, টিকোলো নাক, বিবাহিত, বাড়িতে ডিমওয়ালা এলে প্রত্যেকটি ডিম জলে ডুবিয়ে পরীক্ষা করে তবে কেনে, জামা ছিড়ে গেলে শীতকালে কোটের নিচে পরবার জন্য আলাদা করে জমিয়ে রেখে দেয়, এ-বছরের দোলের জামা কেচে তুলে রাখে আগামীবারের

দোলের জন্য, রাস্তায় চারটে পয়সা কুড়িয়ে পেলে সঙ্গে-সঙ্গে দুটো পয়সা দেয় ভিখিরিকে— এ-হেন হরিশ রোজ চৌরঙ্গিতে নিছক বেড়াতে আসে? শুনে কীরকম আশ্চর্য লাগে। কিন্তু তখন দাঁড়িয়ে কথা বলার সময় নেই হরিশের। চলতে শুরু করেছে, আমাকে সঙ্গে আসতে বলে। ওর সঙ্গে-সঙ্গে আমিও পূর্ববর্ণিত ভ্রমণ-দর্শন সমাপ্ত করি, চোখদুটো বিস্ময়ের চিহ্ন করে। আমার দেখা পেয়ে বিরক্ত হয়নি, বরং একটু খুশিই হয়েছে হরিশ, মনে হল। বলল, 'সন্ধের দিকে আগে একটা টিউশানি করতাম, ছেড়ে দিয়েছি। এখন এখানে রোজ বেড়াতে আসি। মনটা বেশ ভালো থাকে।'

— কেন, এখানে রোজ-রোজ কী দেখার আছে?

— দেখতে জানলেই দেখা যায়। কত সুন্দর-সুন্দর মেয়ে-পুরুষ এখানে...

— তা ঠিক। কিন্তু —

— চোখ জুড়িয়ে যায়, ভাই! সারা কলকাতার ছাঁকা জিনিশ দেখতে পাওয়া যায় যে-কোন সন্ধেবেলা চৌরঙ্গিপাড়ায় এলে। এই সিনেমা-হলগুলোতে, নিউমার্কেটে কেউ খারাপ পোশাক পরে আসেনা। খারাপ চেহারারও কেউ আসেনা বড়-একটা। আমার বড় ভালো লাগে দেখতে এদের।

— সে কী রে, শুধু-শুধু ভালো জামাকাপড়-পরা মেয়ে-পুরুষ দেখতে—

— মেয়ে-পুরুষটা কথার কথা। আমি আসি শুধু মেয়েদেরই দেখতে, ফ্র্যাঙ্কলি বলছি।

— এটা একটা কাজের কথা বটে। কিন্তু তুই তো বেশ স্পষ্ট স্বীকার করলি।

— করবনা কেন? সুন্দর জিনিশ দেখার মধ্যে লজ্জার কী আছে? সারা কলকাতার মধ্যে মাত্র এ-জায়গাতেই তুই একসঙ্গে এত সুন্দর মেয়েদের দেখতে পাবি। স্বাস্থ্যবান, মুখে হাসি মাখানো, কী সুন্দরভাবে পোশাক পরতে জানে, প্রসাধন করতে জানে। চকচকে মুখ — কিন্তু পাউডার কিংবা পেন্ট দেখতে পাবিনা। কারুকে দেখতে প্রজাপতির মতো, কেউ চন্দনা পাখি, কেউ হিরামন। তন্বী, শ্যামা, শিখরিদশনা, পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী, চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা ইত্যাদি-ইত্যাদি সংস্কৃত বিশেষণের সবরকম নায়িকা দেখতে পাবি এখানে। দেখলে চোখ সুস্থ হয়। থাকি ভাই বস্তির পাশে — সেখানে দিনরাত নোংরার মধ্যে চেল্লাচেল্লি, ইস্কুলে দেখতে হয় কতকগুলো হাড়-জিরজিরে ছেলে, পথেঘাটে সবসময় ভিখিরি-ফিকিরি আর কুচ্ছিৎ মানুষের মেলা -- ও-সব দেখতে-দেখতে চোখ পচে যায়। এখানে এসে তাই রোজ খানিকটা সৌন্দর্য দেখে যাই। তুই অবশ্য বলতে পারিস, কেন, সৌন্দর্য কি শুধু মেয়েদেরই মধ্যে? প্রকৃতির—

— না, আমি তা বলতামনা।

— অন্য-কেউ বলতে পারে। কিন্তু কী জানিস, কয়েকদিন গঙ্গার ঘাটে কিংবা

শিবপুরের বাগানে প্রকৃতি দেখতেও গিয়েছিলাম। পোষালনা। গাছপালার প্রধান দোষ ওরা বদলায়না। একইরকম। কিন্তু প্রত্যেকটি মেয়ে আলাদা। এমনকী, এক-একটা মেয়ে এক-একদিন আলাদা। জানিস, আজকাল আমি নভেল-নাটকও পড়িনা। পড়ার দরকার হয়না। এখানে এতগুলো গল্পের নায়িকা। এদের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি বোঝার চেষ্টা করি কোন্ মেয়েটি স্বামীর গরবে গরবিনী, কে লুকিয়ে প্রেম করছে, কার স্বামী লম্পট, কার সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে অনেকদিন পর ছেলেবেলার প্রেমিকের, কে হঠাৎ দেখতে পেল নিজের প্রেমিকের সঙ্গে অন্য মেয়েকে। আমি সব বুঝতে পারি। পেরে লুকিয়ে হাসি। ঐ যে মেয়েটাকে দেখছিস একা-একা উদাসিনীর মতো ব্লাউজপিস্ কিনছে — পরশুদিনই ওকে দেখেছি একটা সুন্দর ছেলের হাত ধরে ঘুরতে, হাসতে-হাসতে গড়িয়ে পড়ছিল তার গায়ে। আজ ওর দুঃখে আমার মনে কষ্ট হচ্ছে। তুই আসবি মাঝে-মাঝে?

যখন কলেজে পড়তাম একসঙ্গে, তখন হরিশ বলত, সব মেয়েই গুপ্তচর। সবকটা মেয়েই স্পাই, জানিস? ও বেশ জোর দিয়ে বলত। ওরা পৃথিবীতে এসেছে শুধু খবর বার করে নেবার জন্য। মেয়েরা জানেনা এমন-কোন জিনিশ আছে? এমন-কোন ছেলেকে দেখেছিস — যে মেয়েদের কাছ থেকে কিছু লুকোতে পেরেছে? মেয়েরা কাছে এসে ছলাকলা দিয়ে হেসে অভিমান করে ছেলেদের পেটের সব খবর বার করে। পেট বা হৃদয় যাই বলিস।

ছাত্রজীবনে আমি শব্দতত্ত্ব নিয়ে খুব মাথা ঘামাতাম। হরিশের এই অভিনব থিয়োরিরও গূঢ় কারণ আমি শব্দতত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করেছিলাম। সেসময়ে আমরা খুব ফিলম দেখতাম — হরিশও ছিল পাঁড় সিনেমাখোর, অবশ্য যদি অন্য কেউ ওর টিকিট কাটত। ভালো-ভালো বই এলে ও কারুকে ওর টিকিট কাটার জন্য প্রায় হাতে পায়ে ধরত। সেসময়ে আমাদের হৃদয়েশ্বরী ছিল ইনগ্রিড বার্গমান। ওকে মনে হত স্বর্গের দেবী। ছায়াছবিতে ওর হাসি, অশ্রু আমাদের ঘন-ঘন হৃৎকম্প ঘটাত। ইনগ্রিড বার্গমানের একটা ছবিও বাদ দিতামনা। ওর নামের আদ্যক্ষর দুটি নিয়ে আমরা আদর করে ওকে ডাকতাম আই বি। আই বি! আই বি থেকে স্পাই ভাবা খুব সহজ, সেই থেকেই হরিশের কাছে সব মেয়েই স্পাই। কিন্তু হরিশ একসময় সব মেয়েদের গুপ্তচর ভাবত, এখন দেখছি ও-ই মেয়েদের পেছনে গুপ্তচরগিরি করে বেড়াচ্ছে। পুরোনো কথা মনে পড়তেই হঠাৎ আর-একটি কথা মনে পড়ল। আমি বিষম উৎসাহে বললাম, 'হরিশ, আই বি কলকাতায় এসেছে।'

— কে?

— তোর মনে নেই। ইনগ্রিড বার্গমান। কাগজে ওর আসার খবর পড়েছিলাম,

আজ দুপুরে দেখলাম গ্র্যান্ড হোটেল থেকে বেরুচ্ছে। ওঃ, এখনো কী রূপ।

— জানি। হরিশ বিমর্ষ গলায় বলেই চুপ করে গেল।

— কী রে। ইনগ্রিডকে একবার দেখতে ইচ্ছে করে না? এত সৌন্দর্য দেখবার ইচ্ছে।

— দেখেছি কাল সন্ধেবেলা নিউমার্কেটে। কী হতাশ হয়েছি কী বলব। এখানে যত রূপসী মেয়েদের দেখি — কারুকে চিনিনা, নাম জানিনা — কিন্তু ওদের ব্যক্তিগত জীবনের কথা কল্পনা করতে আমার ভালো লাগে, মনে-মনে আমি ওদের সম্পর্কে গল্প বানাই। কিন্তু যাকে আগে থেকেই মনে-মনে জানি তাকে স্বচক্ষে দেখলে কী খারাপ লাগে! ইনগ্রিড সম্পর্কে সব জানি, কটা বিয়ে, কটা ছেলেমেয়ে ইত্যাদি। কিন্তু সিনেমায় ওকে মনে হত নন্দন কাননের অপ্সরী। জারের হারানো মেয়ে চিরযৌবনা আনাস্টাসিয়া। কাল তাকে নিজের চোখে দেখলাম — এরকম সাধারণ নগণ্য কুচ্ছিৎ মেয়ে কম দেখেছি। একবার হাই তুলল, দেখলাম, ওফ ...

— কী হল রে।

— হাই তোলা অবস্থায় দেখলাম। একটা বিকট মুখ। ঘোড়ার মতো দুটো বিরাট মাড়ি। কেন যে দেখলাম ওকে। ওর সারা মুখে যা মাখানো দেখলাম — তা স্বর্গীয় সুষমা নয়, নিরবচ্ছিন্ন বোকামি। আমি আর-কোন কল্পনার রূপসীকে কাছ থেকে দেখতে চাইনা। কেন ওর কথা মনে করিয়ে দিলি? বাড়ি যাই।

১৮

দোতলা বাসের ঠিক সামনের জানালায় বসে ছিলাম, তাই অমন সুন্দরভাবে দেখতে পেলাম দৃশ্যটা। সন্ধেবেলা অন্ধকার হয়ে এসেছে, বিশাল চকচকে চৌরঙ্গি, জ্বলে উঠেছে আলো! কীড স্ট্রিট যেখানে এসে মিশেছে চৌরঙ্গিতে, সেখানে মসৃণ কালো চওড়া চৌরঙ্গির ঠিক মাঝখানে একটি লোক শুয়ে আছে।

হঠাৎ ঝাঁকুনি দিয়ে বাসটা থেমে গেল। সমস্ত লোক হুড়মুড় করে এসে উঁকি দিল জানালা দিয়ে। চৌরঙ্গিতে এরকম দৃশ্য আগে কেউ দেখেনি, অথবা দেখেছে হয়তো— দুপাশের সিনেমা-হলগুলোর মধ্যে পর্দায় — কিন্তু এমন জীবন্ত, রক্তমাংসের দৃশ্য। সত্যিই দৃশ্যটির কম্পোজিশনের তুলনা হয়না। চৌরঙ্গি রাস্তাটাকে দেখাচ্ছে ধুধু করা বিশাল, রবিবারের সায়াহ্ন হলেও পথে আর একটি লোকও নামেনি, শূন্য, কালো রাস্তার ঠিক মাঝখানে সাদা পোশাক-পরা লোকটি শুয়ে আছে। এই সন্ধেবেলা ঐ লোকটাই যেন এ রাস্তার অধিপতি। দুহাত দুদিকে

সম্পূর্ণ ছড়ানো, পা-দুটো টান করা। মুখে একটু বিকৃতি নেই, দুঃখ নেই, রাগ নেই — খানিকটা যেন উদাসীনতা। কষ দিয়ে খানিকটা রক্ত গড়িয়ে পড়েছে, দেখা যায় কি, দেখা যায়না।

আমার সঙ্গিনী বললেন, 'উঃ কী ভয়ংকর দৃশ্য!'

আমি বললাম, 'তোমার ভয়ংকর লাগল? আমার তো সুন্দর লাগছে। ঠিক ফাঁকা রাস্তার মাঝখানে — অমন হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকা সিনেমায় দেখলে তো আর্টের প্রশংসা করতে!'

— বাজে বকবক কোরোনা। চলো নেমে পড়ি। এক্ষুনি বাস পোড়াবে।

আমি বললাম, 'না, দেখে মনে হচ্ছে খানিক্ষণ আগে ঘটে গেছে। বাস পোড়াবার হলে এতক্ষণে শুরু হয়ে যেত! কাছেই দেখলাম কয়েকটি পুলিশ ও একটি অক্ষত একতলা বাস দাঁড়িয়ে আছে।'

— তাহলে সরিয়ে নিয়ে যায়নি কেন? এটা কি সকলের দেখার জিনিশ?

— নেবে, নেবে। অনেকরকম নিয়ম-কানুন আছে তো! চট করে ডেড বডি ছোঁয়া যায়না। তুমি মুখ ফিরিয়ে বসো না!

বাসের মধ্যে ততক্ষণ হই-হল্লা, জুতোর শব্দ, জিব ও ঠোঁটের সংযোগে যাবতীয় বিচিত্র ধ্বনি-ব্যবহার শুরু হয়ে গেছে। কয়েকজন উৎসাহী নেমে গিয়ে কাছ থেকে দেখতে গেল, একজন কনস্টেবল কাছাকাছি এসে সরবরাহ করে গেল কিছু তথ্য। আমরা ওপরতলায় বসেই জানতে পারলাম লোকটির পকেটে কোন কাগজপত্র নেই। এখনও অজ্ঞাতপরিচয়। সঙ্গিনীকে বললাম, 'একজন অজ্ঞাতপরিচয় মানুষের এর চেয়ে মহান মৃত্যু আর কী হতে পারে? সকলের চোখের সামনে, রাজার মতো!'

তিনি বললেন, 'একজন মানুষ মরল, আর—'

— কলকাতা শহরের কোথাও-না-কোথাও এই মুহূর্তে নিশ্চয়ই আরও একজন লোক মরছে। সারা পৃথিবীতে কয়েক শো—

— একি কথা হল?

— কেন না? মবা ইজ মরা। মানুষ মরছে এবং মানুষ মরবে — এইটাই আসল। নিজেরা কতক্ষণ বেঁচে আছি সেইটাই বড় কথা, অন্য লোকের মরা নিয়ে দুঃখ করার কী আছে? তাছাড়া এই লোকটা হয়তো আত্মহত্যা করেছে। মরা আর আত্মহত্যা তো এক নয়!

— যাঃ ভাল্লাগেনা। চলো নেমে পড়ি। গোলমাল হচ্ছে। এখনই হয়তো বাসে আগুন লাগানো শুরু হতে পারে।

— না, না, ভয় নেই। আগুন লাগলে গোড়া থেকেই লাগে। তাছাড়া ওটা

আগুনের গোলমাল নয়। বাস ছাড়তে দেরি হচ্ছে কেন হয়তো তা নিয়ে। আবার কেউ কেউ হয়তো বলছে আর একটু পরে, আমার এখনো দেখা হয়নি।

— তুমি তো সব-জান্তা!

— তুমি আগুন লাগাবার ভয় পাচ্ছ। আমি অন্য দৃশ্যও দেখেছি। সকাল দশটার সময় অফিসযাত্রী ভিড়ভর্তি গাড়িতে — ইংরেজিতে যাকে বলে সার্ডিন প্যাকড় — লোকে অদৃশ্য হাতল ধরে ঝুলে চলেছে — এমনসময় একজন লোক পড়ে গেল, পিছনের চাকায় দুটো পা-ই কাটা গেল তার। গাড়ি থেমে গেল, পুলিশ আসবে — তারপর কতক্ষণে ও-গাড়ি ছাড়বে কে জানে! বাসভর্তি লোক চেঁচিয়ে উঠল — পাশ কাটিয়ে টেনে চলো-না ড্রাইভারদাদা, ব্যাটাচ্ছেলে মরার আর সময় পেলনা — এই অফিসের টাইমে, এই নিয়ে তিনদিন লেট!

— সত্যি, এমনভাবে গাড়ি চালায় না! উঃ, কে কতক্ষণে প্রাণ নিয়ে বাড়ি ফিরবে —

— কী মুশকিল। গাড়ি চালাবার কী দোষ। মনে করো-না — গাড়ি-চাপা পড়াটা একটা নতুন রোগ। আগে বন্যায় প্রতি বছর হাজার-হাজার লোক মরত, এখন বাঁধ দিয়ে বন্যা বন্ধ করা হয়েছে। কলেরা-টাইফয়েড-টি বি হলে লোকে বাঁচতনা। এখন ওসব অসুখ তো নস্যি। তার ওপর শান্তির বাণী দিয়ে পৃথিবীর বড়-বড় যুদ্ধ আটকে রাখা হয়েছে। কিন্তু সব লোক তো চিরকাল বাঁচলে চলবেনা। কিংবা সবাই থুত্থুড়ে বুড়ো হয়ে মরলেও অনেক ঝঞ্ঝাট। তাই প্রকৃতি তার নিজের রাস্তা খুঁজে নেয়। এখন দেখা দিয়েছে গাড়ি-চাপা রোগ। ক্যান্সারেরও ওষুধ বেরুবে, কিন্তু গাড়ি-চাপা রোগের ওষুধ বেরুবেনা। কাগজে পড়নি — প্রত্যেক বছর ক্রীসমাসের সময় আমেরিকায় পাঁচ-ছ'শো লোক মারা যায়।

— এর থেকে বাবা, যুদ্ধও ভালো।

— যুদ্ধ আর কী এমন। হিটলার যত লোক মেরেছে, তার চেয়ে পৃথিবীর বেশি লোক মেরেছে মোটরগাড়ি। কতবড় সাংঘাতিক অসুখ তাহলে এটা ভেবে দেখো।

— অসুখে তবু লোকে ভুগে-ভুগে মরে। এ একেবারে —

— বাঃ। তুমি কখনো শোননি — একজন লোক কথা বলছেন কথা বলছেন হঠাৎ এমনসময় উঃ বলে একেবারে অক্কা। কিংবা কোন লোক খবরের কাগজ পড়ছে বসে-বসে — হঠাৎ মাথাটা ঝুঁকে পড়ল সামনে, শেষ? থ্রম্বসিসেও অনেকসময় এইরকম হয়। অথবা, মাঠের মধ্যে গাছতলায় কেউ দাঁড়িয়ে আছে — হঠাৎ কড়াৎ করে বাজ পড়ল! কিছুদিন আগে বুলু দাশগুপ্ত নামে একজন খুব ভালো ফোটোগ্রাফার মারা গিয়েছিলেন এইভাবে — কাগজে পড়নি?

এরকমভাবে মরলে তুমি কার ওপর রাগ করবে? কীসে আগুন লাগাবে? যত রাগ গাড়ির ওপর।

— নিজে যেদিন পড়বে, সেদিন বুঝবে।

— নিজে পড়লে তো আর দুঃখ করার জন্য পরে বেঁচে থাকবনা। তুমি না-হয় দু-এক ফোঁটা চোখের জল ফেলবে।

— ইস্, বয়ে গেছে আমার।

— ভূত হয়ে এসে তাহলে ঘাড় মটকাব তখন বলে দিচ্ছি।

মনোযোগ অন্যদিকে দিতে হল। রাস্তা থেকে নতুন গোলমাল শুনে আমরা আবার জানালা দিয়ে মুখ বার করে দেখলাম। সত্যি-সত্যি কি গাড়িতে আগুন লাগাবে না কি? না, পুলিশের আর-একটা গাড়ি এসেছে, সেইসঙ্গে মৃতদেহ নিয়ে যাবার ভ্যান। দুজন খাঁকি হাফশার্টপরা লোক হাত-পা ধরে ঝুলিয়ে চ্যাংদোলা করে তুলল মৃত লোকটাকে। মধ্যবয়স্ক, মাথায় অল্প টাক, জোয়ান পুরুষ, মুখখানি প্রশান্ত। বয়ে নিয়ে যাবার সময় লোকটার একটা হাত লটপট-লটপট করে ঝুলছিল। 'মড়ার হাত মাটি ছুঁতে চায়—' কমলবাবুর লেখায় পড়েছিলাম। এতক্ষণ নজর পড়েনি, এখন দেখলাম লোকটার এক হাতে তখনও একটা ক্যালেন্ডার শক্ত করে ধরা। প্রাণ ছেড়েছে কিন্তু ক্যালেন্ডারটা ছাড়েনি। ওঃ, লোকটি তাহলে আত্মহত্যা করেনি, আমি বুঝতে পারলাম। কারণ সময় ও ভবিষ্যৎ জানার ওর লোভ ছিল। 'ডেথ কাপীস নো ক্যালেন্ডার' — ছেলেবেলায় ওয়ার্ডবুকে পড়েছিলাম, হঠাৎ মনে পড়ল।

আমাদের বাস তখন ছেড়েই ছুটে চলল হু-হু করে। শীত ফুরিয়ে এবার বসন্তের মিষ্টি হাওয়া লাগছে গায়। আমার সঙ্গিনী আর একটিও কথা না-বলে হঠাৎ চুপ করে গেলেন। ওঁকে কেমন যেন ক্লান্ত দেখাতে লাগল সেইমুহূর্তে। বুকের দিকে মুখ ঝুঁকিয়ে আর কোনদিকে না-চেয়ে বসে রইলেন। আমি আর তাঁকে বিরক্ত করলামনা।

আমরা বেরিয়েছিলাম থিয়েটার দেখব বলে। বাস থেকে নেমে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে হাঁটার পর আমার সঙ্গিনী অকস্মাৎ বললেন, 'আমি আজ আর থিয়েটার দেখতে যাবনা।'

— সেকি! কেন?

— আমার গা গুলোচ্ছে। আমি বাড়ি ফিরে যাব। উঃ, এরকম দৃশ্য যেন আমার কোন শত্রুও কখনো না-দেখে!

— কী ছেলেমানুষ তুমি! এরকম সামান্য ব্যাপার নিয়ে কেউ নিজের মন খারাপ করে! কত কষ্ট করে পেয়েছি টিকিট আর তোমার সঙ্গে এই সন্ধেবেলা।

তা নষ্ট করবে ? আমরা যারা বেঁচে আছি, আমাদের তো আনন্দে থাকতেই হবে। চলো থিয়েটার দেখি—

— থিয়েটার তো দেখলাম ! রাস্তায় ঐরকম দৃশ্য — আর সেই তোমার লেকচার !

১৯

তর্কাতর্কি হচ্ছিল বাড়ির ঝি-চাকরকে অবসর সময়ে লেখাপড়া শেখানো উচিত না কি এই নিয়ে। প্রায় সকলেই এতে একমত ছিলাম, কিন্তু একবন্ধু রেগে উঠে বললেন, 'কী বিশ্রী ধারণা তোমাদের ! বাড়িতে ঝি-চাকরদের লেখাপড়া শেখানো খুব একটা মহৎ কাজ হবে মনে করছ ? বাড়িতে ঝি-চাকর রাখাই যে কত অন্যায়, সেটা বুঝতে পারছনা ? আর কতদিন এরকমভাবে মনুষ্যত্বের অপমান করা হবে ? প্রত্যেকের উচিত, নিজের-নিজের পরিবারের কাজ নিজেদের করে নেওয়া। তাকিয়ে দেখো আমেরিকার দিকে। জান, সেখানে স্বয়ং রকফেলারের বাড়িতেও চাকর নেই ?'

অপর বন্ধু বিনীতভাবে বললেন, 'জানি, কথায়-কথায় আমেরিকার কথা উল্লেখ করা তোমার একটা কু-স্বভাব। আমরা কেউ আমেরিকায় যাইনি, সে দেশ দেখিনি। তবে যতদূর শুনেছি, আমেরিকার সঙ্গে আমাদের দেশের তুলনা করা বোকামি — না, না, তোমার ক্ষেত্রে বোকামি বলছিনা, বরং বলা যায়, বুদ্ধি ব্যয় করার আলস্য। ঝি-চাকর রাখার প্রয়োজনটা পারস্পরিক। সকলেই যদি ভদ্রভাবে জীবিকা অর্জনের সুযোগ পায়, তবে লোকে বাড়িতে ঝি-চাকরের কাজ করতে আসবে কেন ? রিকশা চাপা অমানবিক বলে এখনই সকলে রিকশায় চড়া বন্ধ করে রিকশাওলাদের না-খেতে দিয়ে মেরে ফেলার মধ্যে কোন মনুষ্যত্বের পরাকাষ্ঠা আছে আমি জানিনা। আমেরিকার কথা আপাতত ভুলে, তোমার উচিত রাস্তার একটি ভিখিরির ছেলেকে তোমার বাড়িতে চাকরের কাজ দেওয়া, আর —

— হাঁ, চুরি করে সব ফাঁক করে দিক আর কি !

— সেটুকু লোক চেনার ক্ষমতা নেই ? তাকে কিছু-কিছু লেখাপড়া শেখালে, সে বরং পরে স্বাধীন জীবিকা নেবার সুযোগ পেতে পারে। আর ভিখিরি হয়ে থাকলে, সে পড়ে না-খেয়েই মরত বা চোর-গুণ্ডা হত। একটু লেখাপড়া শেখালে আমাদেরও সুবিধে। অন্তত চিঠি ফেলে দিয়ে আসতে বললে — চিঠিটা রাস্তায়

গিয়ে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে আসবেনা, কিংবা ঘড়িতে চাবি দিতে বললে — সারা বাড়ি খুঁজে চাবি নিয়ে আসবেনা, কিংবা সেই যে, একজন তার চাকরকে বলেছিল — 'আমায় যখন কেউ ডাকবে, তখন আগে তাকে বাইরের ঘরে বসাবে — তারপর আমায় খবর দেবে, বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখবেনা।' তারপর একদিন চাকর এসে বলেছিল, 'আজ্ঞে আপনাকে একজন ডাকছেন, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও বসাতে পারিনি, শেষটায় শুইয়ে রেখে এসেছি!' — অর্থাৎ টেলিফোন!

অপর একজন বন্ধু বললেন, 'চাকরদের লেখাপড়া শেখানো খুব ভালো। কিন্তু তাতে অনেক মূল্য দিতে হয় নিজেদেরও। আমাদের বাড়িতে শত্রুঘ্ন বলে একটি চাকর ছিল। বেশ জোয়ান, ছটফটে ছেলেটা। বড়দা তাকে লেখাপড়া শেখালেন। ছেলেটার মাথাও ছিল, চটপট অনেকখানি শিখে গেল। তারপর বড়দা তাঁর বন্ধুকে বলে কুলটির কারখানায় চাকরি করে দিলেন। এখন বেশ ভালো চাকরি করছে, স্কিলড ওয়ার্কার হয়ে গেছে, কাজকর্ম শিখে ওভারটাইম ইত্যাদি নিয়ে মাসে চারশোর মতো রোজগার — আমার চেয়ে বেশি। একদিন ওর সঙ্গে হাওড়া স্টেশনে দেখা, চমৎকার ফিটফাট চেহারা, প্যান্টালুন, জুতোর সঙ্গে মোজা, নাইলনের হাওয়াই শার্ট। দেখে আমার খুব ভালো লাগল, ছেলেটা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে. শুনলাম বিয়েও করেছে। ওর প্রতিষ্ঠার সবখানি কৃতিত্বই আমাদের পরিবারের — এই কথা ভেবে বেশ গর্বও বোধ করলাম। কিন্তু তারপরই এমন একটা কাণ্ড করল! একটা সিগারেটের প্যাকেট বার করে — একটা কায়দা করে ঠোঁটে আটকাল, তারপর কিছুক্ষণ এ-পকেট ও-পকেট হাতড়ে — ফস্ করে আমাকে জিজ্ঞেস করল, "ছোড়দাবাবু, আপনার কাছে দেশলাই আছে?" আমার এমন খারাপ লাগল।'

— এটা তোমার অন্যায়। দু-একজন চেঁচিয়ে উঠলেন।

— জানি তোমরা কী বলবে। রাস্তার যে-কোন লোক, অচেনা কোন কারখানার শ্রমিক এমনকী কোন ভিখিরিও দেশলাই চাইলে আমরা অপমানিত বোধ করিনা। কিন্তু পুরোনো চাকর চাইলেই অপমানিত বোধ করা আমার ডিকাডেন্ট মেন্টালিটি। তা হয়তো ঠিক। কিন্তু অপমানিত যে হয়েছিলাম, তা অকপটেই স্বীকার করছি। শকড হয়েছিলাম বলা যায়। আগে কখনো চাইতনা, এখন এরকম স্বাভাবিক ভাবে...। বলতে পারো, ওর স্বভাব বদলাবার অধিকার আছে। কিন্তু তাহলে আমাকে 'ছোড়দাবাবু' কেন ডাকল? 'এই যে অমুক বাবু' বলে নাম ধরে ডাকাই ওর উচিত ছিল। বাড়িতে এসে এ-ঘটনাটা বলতে বাড়িশুদ্ধ সবাই, এমনকী বড়দা পর্যন্ত হঠাৎ বিষম চটে গেল শত্রুঘ্নর ওপর। সকলেই ওকে বলল নিমকহারাম।

উপস্থিত অনেকে আমার এ-বন্ধুর গল্প শুনে হেসে ফেললেন। তখন আর

কে-যেন বললেন, কেন শরতের বাড়ির চাকরের গল্প? শরৎ, বলো-না! সে ঘটনাটা সত্যিই চমকপ্রদ। শরৎ বলতে শুরু করলেন :

ছেলেটা সত্যিই ভালো ছিল। মুখ বুজে কাজ করত, মুখে কখনো, কোন বিরক্তির ছায়া ছিলনা। মেদিনীপুরের ছেলে, কী যেন ছিল ওর আসল নাম, আমরা ওকে ডাকতাম মদন বলে। আমাদের বাড়িতে সব চাকরের নামই মদন, পুরুষানুক্রমে চলে আসছে। নিত্যনতুন চাকর এলে প্রত্যেকের নাম মনে রাখা কষ্ট, আর চাকরদের নাম সাধারণত বেশ গালভারি হয় — গোবর্ধন, বগলাপ্রসাদ, দীনতারণ, কালীয়দমন এইসব — কাজেই ওসব ঝঞ্ঝাটের বদলে আমাদের বাড়িতে সবাই মদন। একমাত্র ঠাকুরমারই এই নামে আপত্তি, ওঁর কাছে সব চাকরের নামই বদন, কারণ মদন হাজার-হোক দেবতার নাম, আর চাকরবাকরের নাম ঠাকুর-দেবতার নামে হলে ওঁর নাকি সবসময় বকুনি-ঝকুনি দিতে অসুবিধে হয়।

এ ছেলেটা আমাদের বাড়িতে এসেছিল খুব বাচ্চা বয়সে। নিজের নাম ভুলে ও মদন নামটাই বেশ মানিয়ে নিয়েছিল। সবসময় ফিটফাট পরিচ্ছন্ন থাকত। স্মৃতিশক্তিও ছিল ভালো, বাজার থেকে যা-যা আনতে বলা হত, প্রত্যেকদিন নির্ভুলভাবে সবকটা আনত। ওরকম স্মৃতিশক্তি দেখেই ওকে লেখাপড়া শেখাবার কথা আমাদের মনে আসে। মা ওকে এক-দুই লিখতে শেখালেন। আমার বোন শেখাল অ-আ-ক-খ। তারপরও ওর প্রবল উৎসাহ দেখে আমরা সব ভাইরাই মাঝে-মাঝে একটু-আধটু পড়াতে লাগলাম ওকে। দু-চারখানা বই কিনে দিলাম। ছেলেটা সবকটা বই পড়ে-পড়ে মুখস্থ করে ফেলল, হাতের লেখা লিখে-লিখে লেখাটা করে ফেলল মুক্তোর মতো। ইংরেজিও পড়তে শিখলে কিছু-কিছু। বিশ্বাস করো ছ-সাতবছরের মধ্যেই ছেলেটা প্রায় ম্যাট্রিক স্ট্যান্ডার্ড পর্যন্ত শিখে ফেলল। স্বভাব হয়ে গেল আরও ভদ্র, মার্জিত। চাকর বলে লোকে বুঝতেই পারতনা। অনেকে আমাকে ডাকতে এসে ওকে বলত, তোমার দাদাকে ডেকে দাও তো! আমরাও ওকে একটু সমীহ করতে শুরু করলাম, সবরকমের কাজের হুকুম করতে দ্বিধা করতাম।

ছেলেটা হয়ে উঠল বইয়ের পোকা। আমাদের বাড়ির যাবতীয় বই পড়ে শেষ করল — আমার আলমারির তোমাদের দেওয়া আধুনিক কবিতার বইগুলো পর্যন্ত! দুপুরবেলা, বাড়ির রোয়াকে বসে রাজ্যের ঠাকুর-চাকররা যখন বিড়ি ফুঁকতে-ফুঁকতে এক-এক বাড়ির কেচ্ছা বিনিময় করে, আমাদের মদন তখন ছাদের সিঁড়িতে বসে-বসে গল্পের বই পড়ছে। অন্য চাকরদের সঙ্গে একদম মিশতনা। কোন কুসংসর্গে পড়েনি, মাইনে পেয়ে প্রত্যেকমাসে দেশে টাকা পাঠায় নিজে মনিঅর্ডার ফর্ম ফিল-আপ করে। আমরা ওকে অন্য কোথাও একটা চাকরি জুটিয়ে

দেবার কথা বলেছিলাম। যেতে চায়নি। মদন বলত, এ-বাড়িতে ও ঘরের ছেলের মতো আছে। যদি এ-বাড়ির কাজ ছেড়েই দেয় — তবে অন্য কোথাও ও আর চাকরি করবেনা — কারখানা বা অফিসেও না, ও স্বাধীনভাবে ব্যবসা করবে। সেজন্য পয়সা জমাচ্ছে।

যা হোক, চাকর হিশেবে মদন আইডিয়াল। মালটিপারপাস চাকর। আমার বাবা চোখে ভালো দেখতে পেতেননা। দুপুরবেলা মদনের অতিরিক্ত কাজ হল বাবাকে খবরের কাগজ পড়ে শোনানো। সেজন্য ওর তিনটাকা মাইনে বাড়িয়ে দেওয়া হল। ও পুরো কাগজটা, প্রথম লীড থেকে শেষপাতার প্রিণ্টারস লাইন পর্যন্ত সবকথা, বিজ্ঞাপন সমেত তন্ন-তন্ন করে পড়ে শোনাত। বাড়ি থেকে সকলে বেরিয়ে গেলেও মদনকে পাহারা রেখে যেতাম নির্ভয়ে। তারপর —

তারপর একদিন সকালে আর মদন নেই। একটা অলওয়েভ রেডিও আর আমার মেজো ভায়ের একটা হাতঘড়িও নেই। আছে মদনের একটি চিঠি, টেবিলের ওপর চাপা দেওয়া। অনবদ্য চিঠি। ঠিক ভাষাটা মনে নেই। তবে অনেকটা এইরকম। আমার মাকে লেখা:

শ্রীচরণকমলেষু মা,

কিছুকাল হইতে আমার একঘেয়ে লাগিতেছিল জীবন। তাই ভাগ্যপরীক্ষার জন্য বাহির হইয়া পড়িলাম। ব্যবসাই করিব ঠিক করিয়াছি। এখন আপনার আশীর্বাদ পাইলে হয়। পুরা মূলধন হাতে নাই, তাই রেডিও আর ঘড়িটা লইয়া গেলাম। দুটোই আপনাদের অপ্রয়োজনীয়। বড় দাদাবাবু একটি নতুন ট্রানজিস্টার রেডিও কিনিয়াছেন, সুতরাং এটাতে আর আপনাদের কী দরকার? একবাড়িতে দুটো রেডিও রাখার দরকার দেখিনা। ট্রানজিস্টারটা বড়দাদাবুর শখের, তাই অলওয়েভটাই লইলাম। আর মেজদাদাবাবু, গতমাসে বিবাহে একটা সোনার হাতঘড়ি পাইয়াছেন। সেটি লইনাই। কিন্তু তিনি পুরানোটি দিয়া এখন কী করিবেন? বাড়ির আর-সকলেরই হাতঘড়ি আছে। মেজদাদাবাবু দুই হাতে দুইটি ঘড়ি পরিবেননা জানি। সেরকম কাহাকেও দেখিনাই। সুতরাং পুরানোটি আমি লইলাম। তবে শপথ করিতেছি, একদিন-না-একদিন এই দুইটি জিনিশের দাম ঠিকই আপনাদের শোধ করিয়া দিব। ইতি আপনার দাস — মদন।

আমাদের পরিবারে একটা মিটিং বসে গেল — পুলিশে খবর দেওয়া হবে কিনা, এই নিয়ে। মায়ের প্রবল আপত্তি। শেষপর্যন্ত সবাই ঠিক করল পুলিশে জানানো হবেনা। মদনের চিঠিটা ভাঁজ করে রেখে দেওয়া হল। বাড়িতে আত্মীয়-স্বজন এলে মা তাঁর চাকরের গৃহ-শিক্ষার নিদর্শনটি গর্বের সঙ্গে দেখাতেন।

দিন-পনেরো পর, আর-একটা চিঠি এল। মদন লিখেছে, সে বিষম অনুতপ্ত।

সে খুব দুরবস্থায় আছে। পাপকাজ দিয়ে শুরু করলে কোন উদ্দেশ্যই সফল হয়না। তার ওপর আমাদের যে বিশ্বাস ছিল সেটা ভঙ্গ করে সে মহাপাপ করেছে। হাতঘড়িটা সে বেচে ফেলেছে। কিন্তু রেডিওটা সে ফেরত দিতে চায়। তাছাড়া চোরাই মাল বলে লোকে মাত্র ৬০।৭০ টাকায় কিনতে চায় ওটা। কিন্তু মায়ের অমন দামি শখের জিনিশটা সে জলের দামে বেচতে পারেনি। ওটা সে ফেরত দেবে — কিন্তু নিজে মুখ দেখাতে চায়না। বউবাজারের একটা ঠিকানায় বলাই নামে একটি লোকের কাছে ওটা আছে, আমরা যেন কেউ গিয়ে নিয়ে আসি। এবং মদনকে সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা করি।

এবার পুলিশে খবর দিলাম। কারণ ঠিক্কানাটা বউবাজারের একটি কুখ্যাত পল্লীর। পুলিশের লোক তো পুরো ঘটনাটা শুনে হেসেই বাঁচেনা। তারপর বলল, কাল ভোরে হানা দেবে। চোরাইমাল উদ্ধারের জন্য ভোরে হানা দেওয়াই নাকি প্রকৃষ্ট উপায়। আমাকেও সঙ্গে যেতে হবে আইডেন্টিফাই করতে।

গেলাম। একটু দূরে দুজন সেপাইকে নিয়ে ইন্সপেক্টার আর আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। একজন সাদা পোশাক-পরা পুলিশ চিৎকার করে ডাকতে লাগল, 'বলাই, বলাই!' তখনো ভালো করে ভোর হয়নি, সাড়ে চারটে-পাঁচটা বাজে। অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর দোতালার জানালা দিয়ে একটা শুটকো মতো লোক গলা বাড়িয়ে বলল, 'কে?' তারপরই কী ভেবে মুখটা সরাৎ করে ভেতরে ঢুকিয়ে নিল আবার। আর কোন সাড়া-শব্দ নেই। তখন ফের শুরু হল ডাকাডাকি, দরজায় ধাক্কা। এবার একটি মেয়েছেলে দরজা খুলে জানাল, এখানে বলাই বলে কেউ থাকেনা। আমরা সবাই হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লাম বাড়ির মধ্যে। ইন্সপেক্টার প্রবল ধমক দিয়ে বললেন, 'ডাক বলাইকে। দেখেছি সে দোতালায় আছে! বেগড়বাই করবি তো সবাইকে চালান দেব!'

বলাই নেমে এল এবং মা কালীর দিব্যি করে জানাল, সে মদন বলে কারুকে চেনেনা।

—চিনিস না-চিনিস রেডিওটা বার কর আগে। —

—কিন্তু রেডিওর তো সব পার্টস খুলে ফেলা হয়েছে! —

—নিয়ে আয় সেই খোলা পার্টস! এরপর ইন্সপেক্টার হুংকার দিয়ে উঠলেন, 'এবার বল সেই ধম্মপুত্তুর মদনটা কোথায়?' — পেছন থেকে মেয়েটা হঠাৎ বলল, 'সে এখানে থাকেনা, সত্যিই থাকেনা, তাকে ছেড়ে দিন বাবু!'

একটা জিনিশ দেখে আগাগোড়া অবাক হয়েছিলাম যে, মাত্র ১৫ দিনের মধ্যে মদন এসে কোন্ পরিবেশে উঠেছে। আগে সে কারুর সঙ্গে মিশতনা। বেশ-একটা রুচিজ্ঞান ছিল। একটা অন্যায় করার সঙ্গে-সঙ্গে চুম্বকের মতো

আন্ডারওয়ার্লড তাকে টেনে এনেছে। আবার একটা দরদ-দেখানো মেয়েও জুটিয়েছে। মেয়েটা তখনও বলছে, 'মদনকে ছেড়ে দিন বাবু, সে বেচারি —'

আমি আগাগোড়া চুপ করেই শুনছিলাম। শরতের গল্প শুনতে-শুনতে খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। ভৃত্যতন্ত্র সম্পর্কে আমার উৎসাহ কম, অভিজ্ঞতাও নেই। আমাদের বাড়িতে কোনদিন চাকর রাখা হয়নি। ফুটফরমাশ বেশির ভাগ আমাকে দিয়েই খাটানো হয়। কিন্তু হঠাৎ একটা মজার প্রশ্ন মনে পড়তেই আমি শরতের গল্প-বলা থামিয়ে দিলাম। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, একটা প্রশ্ন তোমাদের কারুর মনে এসেছে? মদন চুরি-করা শিখল কী করে?'

কারণ মদন খুব বাচ্চা বয়েস থেকে আছে শরৎদের বাড়ি। ওখানেই বড় হয়েছে। অন্য চাকরদের সঙ্গে মিশতনা। লেখাপড়া শিখেছে। শরৎদের বাড়ির পরিবেশেই মানুষ। আর পরিবেশ অনুযায়ীই তো মানুষের চরিত্র তৈরি হয়। তাহলে, চুরি করার কথা ওর মনে এল কী করে? শরৎদের বাড়িতে নিশ্চয়ই চুরিবিদ্যের চর্চা নেই, আশা করা যায়। আর পাঠ্যবইগুলোর মধ্যেও বোধহয় চুরি করতে শেখানো নেই। তবে ছোঁড়াটা শিখল কোথা থেকে?

বন্ধুদের দু-একজন বললেন, 'আঃ আগে গল্পটা শেষ করতে দে-না।' আমি বললাম, 'ছিঁচকে চুরির গল্প কী-আর-এমন রোমাঞ্চকর হবে। তার চেয়ে এ-প্রশ্নটা অনেক জরুরি। আমার তো মনে হয়, ঐ যে বললে ও রোজ দুপুরে খবরের কাগজ পড়ে শোনাত — সেই খবরের কাগজ থেকেই চুরি করতে শিখেছে। বিশেষ করে ওর ছিল ব্যবসা করার ইচ্ছে। খবরের কাগজে কি প্রত্যেক দিন ও পড়েনি বড়-বড় ব্যবসায়ীদের চুরির কাহিনী? চুরির খবরেই তো ভর্তি। এক-একদিন এক-একজন বাঘা-বাঘা ব্যবসায়ীর চুরির কাহিনী! আর-একটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট, মদন চুরি করল ঘড়ি আর রেডিও, কিন্তু শুধু রেডিওটা ফেরত দেবার কথা লিখেই সে নিজেকে সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা পাবার অধিকারী ভাবল কী করে? এটাও সে শিখেছে খবরের কাগজ পড়ে! সে শিখেছে চুরি করার পর অর্ধেকটা ফেরত দিলেই আর কোন শাস্তি নেই, অপমান নেই, একেবারে সসম্মানে মুক্তি। দেখনি কাগজে কৃষ্ণমাচারীর ঘোষণা? ব্ল্যাকমানির বাংলা চোরা-টাকা — যাদের কাছে লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি চোরা-টাকা আছে, তারা যদি স্বেচ্ছায় এসে স্বীকার করে — ব্যাস, তা হলে শুধু ৬০ ভাগ জমা দিয়ে দিলেই হবে। আর সব মাপ, কোন বিচার নেই, শাস্তি নেই। চম্বলের ডাকাতদেরও আত্মসমর্পণ করার পরও শাস্তি হয়েছিল। কিন্তু যে ব্যবসায়ীরা চোরা কারবার করে, খাদ্য বাজার থেকে লুকিয়ে, ওষুধে ভেজাল দিয়ে পরোক্ষভাবে বহু লোককে খুন করে কোটি-কোটি টাকা

জমিয়েছে — তারা শুধু এসে একবার স্বীকার করলেই হল, ষাট ভাগ জমানো টাকা জমা দিয়ে দিলেই হল, আর কোঁন শাস্তি নেই! যে আসনে ছিল সেখানেই রয়ে গেল। মদনও দেখেই শিখেছে নিশ্চিত। মদনের আর দোষ কী! মদনকে লেখাপড়া শিখিয়ে বেশ করেছিলে, কিন্তু খবরের কাগজ পড়তে দিলে কেন? তাইতো ও মহাজনদের পথ অনুসরণ করতে চেয়েছে!'

২০

ভিড়ের মধ্যে তীক্ষ্ণ, তেজি মেয়েগলার আওয়াজ শুনতে পেলাম, 'নো, আ আম নট গননা সীট দেএর, আ আম অল রাইট!'

লম্বা ট্রামের একপাশে আমি, অন্যদিকে এই ঘটনা। আমি ছটফটিয়ে উঠলাম। তৎক্ষণাৎ অকুস্থলে উপস্থিত হতে ইচ্ছে হল আমার, কিন্তু অত ভিড় ঠেলে সামনে এগুবার সাধ্য তখন বাতাসেরও নেই। ইচ্ছে হল, লোকের কাঁধের ওপর উঠে উঁকি মেরে দেখি। যদিও কথাটা সাধারণ, এর মধ্য থেকে রোমাঞ্চকর কাহিনীর সূত্র আবিষ্কার করার কোন কারণ নেই। নিশ্চিত কোন মহিলাকে দেখে — লেডিজ সীটে বসে থাকা পুরুষেরা, পাশাপাশি দুটি সীটে চারজন পুরুষ — এ ওর মুখের দিকে তাকিয়েছে, কেউ জানালায় মুখ ফিরিয়েছে, কেউ অন্ধ ও বধির সেজেছে, প্রত্যেকেই আসলে একাগ্র হয়ে ভেবেছে, আঃ, অন্য সীটটা খালি করুক-না, ... আর সেই সময় ঘর্মাক্ত, পিষ্ট দাঁড়িয়ে থাকা পুরুষরা জিঘাংসার মনোবৃত্তিতে বলেছে, কর্কশ গলায়, 'এই-যে, দেখতে পাচ্ছেননা, লেডিজ সীটটা ছাড়ুন।' — আর তখন দুই সীটের লোকেরা আড়চোখে তাকিয়ে দূরত্ব মেপেছে — কোন আসন দণ্ডায়মান অপেক্ষমাণ মেয়েটির সবচেয়ে কাছে — সেই অনুযায়ী দুজন লোক প্রবল অনিচ্ছা সারাশরীরে ফুটিয়ে গা মোচড়াতে-মোচড়াতে — মুখে, ঈশ্বর জানেন, কী বিড়-বিড় করতে-করতে উঠেছেন। আর তখন এবংবিধ লাঞ্ছনার পর, সেই রমণী যদি আত্মসম্ভ্রমশীলা হন, বলেছেন, থাক, আপনারাই বসুন, আমি বসবনা। এ তো খুব সাধারণ কাণ্ড! প্রতিদিনের অসংখ্য। কিন্তু আমি অন্যরকম গন্ধ পেয়েছিলাম। কারণ, গলার আওয়াজটা অত্যন্ত জোরে, কোন মেয়ের পক্ষে। ইংরেজি উচ্চারণ বিদেশি ধরনের, 'নো' কথাটা এমনভাবে বলেছে, যেন সংস্কৃতের মতো বিসর্গ আছে, নোঃ।

তখন ওখানে গুঞ্জন চলছে, মেয়েটি আরও কিছু বলল, বোঝা গেলনা। আমি অতিকষ্টে আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আরও তিন ইঞ্চি লম্বা হয়ে — কণ্ঠস্বরের

অধিকারিণীকে একপলক দেখতে পেলাম। সঙ্গে-সঙ্গে চমৎকৃত হতে হল।

জ্বলজ্বলে হলদে রঙের স্কার্ট-ব্লাউজপরা একটি কুচকুচে কালো মেয়ে। খুব সম্ভবত নিগ্রো, বয়েস উনিশ-বাইশ, ট্রাম একটা মিশনারি কলেজের সামনে একটু বেশি থেমেছিল, হয়তো সেখানকার ছাত্রী। মুখ দেখে মনে হল, মেয়েটি কোন কারণে খুব রেগে গেছে, আঁটসাঁস্থ্যে উদ্ধত শরীর, সকালবেলার আপিস-মুখো ট্রামে একটি মূর্তিমান ব্যতিক্রম। এইসব জল-রঙ মানুষ, যাদের পকেটে ময়লা রুমাল, ফর্সা জামার নিচে ছেঁড়া গেঞ্জি, পালিশ করা জুতোর মধ্যে ফুটো মোজা — যাদের জীবনে একমাত্র উত্তেজনা সহযাত্রীর পা মাড়িয়ে দিয়ে খানিকটা ঝগড়াঝাঁটি করা (সবসময় ভেতরে-ভেতরে সজাগ থেকে, মারামারি পর্যন্ত না-এগোয়) — তাদের মধ্যে ঐ নিগ্রো মেয়েটি, ওর ঐ অটুট কালো শরীর ও হলদে পোশাক মিলে যেন একটা রঙের হৈ-হৈ পড়ে গেছে, তাছাড়া ঐ তেজি, দ্বিধাহীন সরল কণ্ঠস্বর। একটুকরো আবার শুনতে পেলাম : ইউ পিপল হেইট মী ! আমার আন্তরিক বাসনা হল ঐ দৃশ্য কাছাকাছি গিয়ে উপভোগ করি কিংবা অংশ নিই, কিন্তু এমন ভিড়, আঃ অসম্ভব ! মেয়েটি কেন বলছে, লোকে ওকে ঘৃণা করছে ? যদি ওর সঙ্গে দু-একটা কথা বলতে পারতাম !

আমি বিদেশি নারী-পুরুষ দেখলেই অযাচিতভাবে কথা বলার চেষ্টা করি। দেখেছি তাতে ওরা খুশিই হয়। আমাদের দেশের যেসব লোক বিদেশে গেছে, তাদের অভিজ্ঞতা এই যে বিদেশের রাস্তায় হঠাৎ কোন লোক ডেকে কথা বললে খুব ভালো লাগে। তাতে মনে হয়, ওদেশের সাধারণ লোকও তাকে গ্রহণ করেছে, স্বীকার করছে। কিন্তু আমাদের দেশে বিদেশিদের সঙ্গে এমন ব্যবহার সচরাচর করা হয়না, সঙ্গে পাই আমি চেষ্টা করি, আমার ইনজিরি জ্ঞানের জন্য লজ্জা হয়না, আমি বাঙালিদের সঙ্গে ভুল ইংরেজি বলে ফেললে লজ্জা পাই, সাহেব-মেমদের না। এখানে ভিড় ঠেলে এগুতে না পারার দুঃখে মরমে মরে গেলাম। একবার চেষ্টা করে নাকে গুঁতো খেয়ে চক্ষে অন্ধকার দেখছি।

অথচ ওখানে কেউই মেয়েটির সঙ্গে স্পষ্ট কথা বলছেনা। অনেকেই পরোক্ষে উক্তি করছে। কেউ-বা বাংলায় মন্তব্য, ওরে বাবা কী তেজ রে ... কালো মেমসাহেবদের চোট সাদা মেমদের তিনগুণ বেশি হয় ... আপিসের টাইমে ওঠা কেন বাবা ! ...

আমি তখনই ঠিক করলাম, নেমে যাবার সময় মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে হবে। এখন এগিয়ে যাবার যখন কোন উপায় নেই। তাছাড়া সবাইকে গোঁত্তা মেরে ঠেলেঠুলে গিয়ে মেয়েটির সঙ্গে কথা শুরু করলে — পঞ্চাশজোড়া চোখ আমার দিকে চেয়ে থাকবে। কে কী মন্তব্য করে, তাই বা ঠিক কি ! থাক। ততক্ষণ আমি

মেয়েটির সঙ্গে মনে-মনে কথা বলা শুরু করলাম। আমাদের কাল্পনিক সংলাপ নিম্নরূপ:

আমি: তুমি কি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান না নিগ্রো?

মেয়েটি: (তখনো মুখে ক্রোধ) অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান? কী বিশ্রী এই কথাটা। তোমরা এ-নামটা বদলাতে পার না। একটা জাতকে উল্লেখ করার সময়, সবসময় তাদের কুৎসিত জন্মবৃত্তান্তটাও উল্লেখ করতে হবে! না, আমি তোমাদের ঐ সো-কলড অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান নই।

— ও, তবে নিগ্রো বুঝি?

— নিগ্রো? ছি, ছি, তোমাদের লজ্জা করেনা? 'নিগ্রো' কোন জাতের নাম হয় বুঝি? তুমি নিজে কি মঙ্গোলিয়ান না ড্রাভিডিয়ান? আমি একজন আফরিকান! সাউথ আফরিকা আমার দেশ।

— ও, আচ্ছা, মাপ চাইছি। কিন্তু তুমি বড্ড রেগে আছ। ওখানে কী হয়েছিল? কেউ খারাপ ব্যবহার করেছিল?

— বিশেষ কিছু না, এমন খারাপ ব্যবহার তো তোমাদের দেশে সবাই করছে!

— কেন, একথা বলছ কেন?

— তোমরা কালো লোকদের ঘেন্না করো। বিদেশের কালো লোকদের। তোমরা নিজেরাও যদিও কালো। তুমি নিজেই তো আবলুষ কাঠের মতো কালো।

আমি একটু আহত হয়ে মনে-মনে সংলাপের মধ্যেও আরও মনে-মনে বললাম, যাঃ এটা কী বলছ, আমার চেনাশুনো মেয়েরা তো আমাকে বেশ ফরসাই বলে। তা যাকগে, এই ট্রামের মধ্যে কালো-সাদার কী দেখলে?

আমাকে দেখেই দুটো লোক ধড়পড় করে সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল—

— ওঃ, হো-হো, তুমি বুঝি এটা জাননা? এতে কালো-সাদার কী আছে? মেয়েদের দেখলে আমাদের দেশের গাড়ি-টাড়িতে সৌজন্য দেখিয়ে জায়গা ছেড়ে দেওয়া হয়।

— ডোনট টক রট। ওসব জানি, এতদিনে জেনে গেছি — কতটা সৌজন্য আর কতটা বাধ্যতামূলক। কিন্তু দুটো লোক উঠল কেন? একজন উঠলেই তো আমি আর-একজনের পাশে বসতে পারি!

এবার আমি, মনে-মনেই যখন কথা, তখন একটু ইয়ার্কির লোভ সামলাতে পারলামনা। বললাম, তোমাকে এমন সুন্দর দেখতে, তোমার জন্য তো গাড়িসুদ্ধু সকলেরই জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়ানো উচিত ছিল!

মেয়েটি একটু মুচকি হেসে বলল, তোমার এটা বাজে খরচ হল। যাক, আমি আগেও দেখেছি, আমি বসলে পাশে আর কেউ বসেনা। অত্যন্ত ভিড়ের গাড়িতেও

একটা জায়গা ফাঁক পড়ে থাকে!

— তুমি ভুল বুঝেছ। অচেনা মেয়ের পাশে এসে বসে পড়া আমাদের দেশে এখনও চালু হয়নি। তুমি কালো বলে বা নিগ্রো ... থুড়ি আফরিকান বলে নয়। শুধু-শুধু তুমি একটা ধারণা করে বসে আছ যে, কালো বলে লোকে তোমাকে অপছন্দ করছে!

— শুধু-শুধু ? তুমি জান তোমাদের একজনের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলাম। সেখানে একটা বাচ্চা আমাকে দেখে ভয় পেয়ে কেঁদে ফেলেছিল।

— সে একধরনের কাঁদুনে বাচ্চা থাকে। যে-কোন অচেনা লোক দেখলেই কাঁদে। আমেরিকান বা জাপানি হলেও কাঁদত।

— খুব লুকোবার চেষ্টা করছ। আমাদের দক্ষিণ আফরিকায় সাদা লোকরা আমাদের কুকুরের মতো ঘেন্না করে। সেইজন্য বাবা-মা আমাকে পড়াশুনোর জন্য পাঠালেন ভারতে। তোমাদের শুনেছিলাম জাতিভেদ প্রথা আছে। কিন্তু বর্ণবিদ্বেষও কম নেই। তোমরা সবাই কালো — একটু রঙের হেরফের, এরই মধ্যে যে এক পোঁচ ফর্সা, তার অহংকারে মাটিতে পা পড়েনা। জান, আমাদের ক্লাশের একটি বাঙালি মেয়ে বলছিল, তার দিদির বিয়ে হয়নি, কারণ রং কালো।

— সে নিশ্চয়ই শুধু কালো নয়, সেইসঙ্গে নাক খ্যাঁদা, কাঠিকাঠি হাত-পা, বেঁটে। এমনিতে সুশ্রী আর স্বাস্থ্যবান হলে — শুধু কালো রঙের জন্য আজকাল আর বিয়ে আটকায়না। এই ধরো-না, তোমার তো রং কালো — কিন্তু তোমার মতো এমন সুন্দর চেহারার মেয়ে যদি বিয়ে করতে রাজি হয় তবে এদেশে হাজার ছেলে তোমাকে বিয়ে করতে চাইবে।

— যাও, যাও, শুধু ঠাট্টা করছ। কালো রঙের জন্য আমার মোটেই লজ্জা নেই। তোমাদের থাকতে পারে। আমি কালো রংকেই সবচেয়ে সুন্দর মনে করি।

হঠাৎ দেখি ট্রাম ওয়েলিংটনে এসেছে, আর সেই মেয়েটি ভিড় ঠেলে নামার চেষ্টা করছে। আমার চমক ভাঙল। এতক্ষণ মনে-মনে কথা বলছিলাম এবার মেয়েটির সঙ্গে সত্যিই দু-একটা কথা বলতে হবে। আমিও টুপ করে নেমে পড়লাম। কী করে কথা আরম্ভ করি? মেয়েটি নেমে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। তারপর দেখি পানের দোকানে গিয়ে কী যেন জিজ্ঞেস করছে, দোকানদাব বুঝতে পারছেনা। এই সুযোগে আমি কাছে গিয়ে বলি, 'তোমায় কোন সাহায্য করতে পারি?'

মেয়েটি কালো মুখ আলো করে এক ঝলক হেসে বলল, 'এখানে ডকটরস লেন এই নামের রাস্তাটা কোথায় বলতে পার?'

— হ্যাঁ নিশ্চয়ই? কাছেই তো! আমিও ঐ দিকে যাচ্ছি — আমার সঙ্গে

আসতে পারো।

— ধন্যবাদ।

কয়েক পা একসঙ্গে চলার পরই নাকি বন্ধুত্ব হয়ে যায়। তাই আমি জিজ্ঞেস করি, 'ট্রামে কি তোমার কোন অসুবিধে হয়েছিল?'

— বিশেষ কিছু না। সামান্য ব্যাপার। আমার হঠাৎ মাথা গরম হয়ে যায়—!

দেখলাম মেয়েটি বিশেষ কথা বলতে উৎসাহী নয়। কিন্তু ইতিমধ্যে তো মনে-মনে কথা বলে আমি ওর চরিত্র তৈরি করে ফেলেছি। মনে হল, আমার রং যথেষ্ট কালো নয় বলেই বোধহয় মেয়েটি আমাকে পছন্দ করছেনা।

পার্কের ওপাশে একটি সাহেব দাঁড়িয়েছিল। টকটকে ফর্সা রং। সুপুরুষ, স্বাস্থ্যবান। ইওরোপীয় সম্ভবত, উচ্চবিত্ত অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানও হতে পারে! সাহেবটি এই মেয়েটিকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল, 'হাই জেনি!'

মেয়েটি ওকে দেখতে পেয়েই চঞ্চলা, গতিশীলা হয়ে গেল। এক ছুটে গিয়ে সাহেবটির বাহুলগ্না হল। আমাকে একটা বিদায় জানাবার কথাও মনে পড়েনি। আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ওরা দুজনে একসঙ্গে এগিয়ে গেল খানিকটা, তারপর কী মনে করে মেয়েটি হঠাৎ পিছন ফিরে আমার উদ্দেশে হাত নেড়ে দিল একবার।

২১

একটি লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হল, তিনি বারবার বলতে লাগলেন, এমন বদলে গেল! এমন বদলে গেল! কথা বলার সময় তাঁর কপালের একটি শিরা কাঁপে।

—এখানে তেত্রিশ নম্বর বাড়িটা ছিল, কোথায় গেল?

পার্কের উল্টোদিকের ফাঁকা মাঠে চুন, সুরকি, বালি ডাঁই করা। মিস্ত্রিরা বসে-বসে ইট ভেঙে খোয়া করছে, কয়েকটা বাঁশ পুঁতে তার সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়েছে ছাতা। এমন রোদ্দুর যেন মানুষগুলো চোখের সামনে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। লাল শাড়িপরা একটি মেয়ে রাস্তা পার হয়ে গেল, যেন বহে গেল একটা লাল ঢেউ, জাপানি ছবির মতন যেন অদৃশ্য চারিদিকের মধ্যে একটি লাল রেখার ঝলক। লাল রং গ্রীষ্মকে বেশি আকর্ষণ করে, মেয়েটি যেন এক দুপুরের সমস্ত গ্রীষ্ম সরিয়ে নিয়ে অত্যন্ত প্রশান্ত ভঙ্গিতে হেঁটে চলে গেল। এই রোদ্দুরে তার সামান্য আক্ষেপ নেই। মেয়েরা শীত এবং গ্রীষ্ম উভয় সময়েই সমুদ্বিগ্নমনা।

ভদ্রলোক মেয়েটির অপস্রিয়মাণ মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে কী যেন দেখার চেষ্টা করলেন। তারপর মুখ ফিরিয়ে, ইট-ভাঙা মজুরদের দিকে তর্জনী নির্দেশ করে পানের দোকানওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে তেত্রিশ নম্বর বাড়িটা ছিল, কোথায় গেল।'

লোকটি বেশ লম্বা অথবা অত্যন্ত রোগা বলেই বেশি লম্বা দেখায়, রং কালো, সুপুরুষ বলা যায়না, কিন্তু চোখে এমন-একটা ক্লান্তি ও বিষণ্ণতা আছে যাতে তার মুখকে একটা আলাদা সৌন্দর্য দিয়েছে। ফাঁকা মাঠের দিকে তাকিয়ে তিনি তেত্রিশ নম্বর বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করছেন। লোকটির লম্বা ছায়া পড়েছিল ফুটপাতে, অজান্তে সেই ছায়ার ওপর আমি দাড়িয়েছিলাম বলেই হয়তো লোকটির সঙ্গে অল্পক্ষণের মধ্যে আমার আত্মীয়তা হয়ে গেল।

— বাড়ি তো ছবছর আগে ভাঙা হয়ে গেছে।

— তা তো দেখছি। কিন্তু সে বাড়িব লোকেরা?

— পালবাবুরা। জীবনবাবু চলে গেলেন বোম্বাই, তাঁর ভাই এ-বাড়ি বিক্রি করে দিযে চম্পাহাটিতে বাড়ি করেছেন, আশি হাজার দাম পেয়েছিলেন, বাড়ির তো নয়, বাড়ি তো লঝঝরে হযে গিয়েছিল, জমিরই তো দাম!

— না, না তুমি ভুল করছ। আমি তেত্রিশ নম্বর বাড়ির কথা বলছি। সে বাড়িতে তো পাল বলে কেউ থাকতনা। ওটা ছিল রায়চৌধুরীদের বাড়ি। পরমেশ রাযচৌধুরী, অনিমেষ, অবিনাশ —

— না বাবু, আমি তো এসে পালবাবুদেরই দেখছি। আপনার বোধহয় ঠিকানা ভুল হয়েছে। এ-বাড়ি পালবাবুরাই বিক্রি কবেছেন।

— না আমার ভুল হযনি। দোতলা বাড়ি, সামনে ঝুল বারান্দা, বারান্দাটা পুরো ছিল জাল দিয়ে ঘেরা, ওখানে পরমেশবাবু ঝাঁক-ঝাঁক মুনিয়া পাখি পুষতেন। বাড়ির দুপাশে রোয়াক, তিন-চার ধাপ সিড়ি দিয়ে উঠে সদর দরজা —

কথা বলতে-বলতে লোকটি আবাব চুন-সুরকির স্তূপ আর মিস্ত্রি বসে-থাকা ফাকা মাঠেব দিকে তাকালেন। এইসময় এগিয়ে এসে আমি ভদ্রলোকেব সঙ্গে আলাপ করলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি বুঝি অনেকদিন পর কলকাতায় এলেন?'

— হ্যা, প্রায পনেরো-ষোলো বছর। ঠিক ষোলো বছর চার মাস পর। আপনি রায়চৌধুরীদের চিনতেন?

— না, আমি এদিককার কিছু চিনিনা। তবে মনে হচ্ছে, রায়চৌধুরী ও-বাড়ি বিক্রি করেছিলেন পালদের, পালরা আবার বিক্রি করে গেছে। এখন ভেঙে ফেলা হয়েছে।

— কিন্তু রায়চৌধুরীদের তো এ-বাড়ি বিক্রি করার কোন কারণই ছিলনা।

— ষোলো বছর বড় দীর্ঘ সময়।

— তা ঠিক।

লোকটি একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। রাস্তার আশেপাশে অন্য বাড়িগুলোর দিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন একবার। তারপর আপন মনেই বলতে লাগলেন, অনেক বদলে গেছে। আর কোন-কোন বাড়ি ভেঙে নতুন হয়েছে বা অদৃশ্য হয়েছে ঠিক মনে পড়ছেনা, কিন্তু বুঝতে পারছি, অনেক বদলে গেছে।

তারপর আমার দিকে ফিরে আবার বললেন, 'রায়চৌধুরীদের ঠিকানা কোথা থেকে পাই বলতে পারেন?'

আমি আগেই জানিয়েছি যে আমি এ-অঞ্চলের লোক নই, রায়চৌধুরীদের চিনিনা, সুতরাং আমাকে ও-প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা অবান্তর। তবু লোকটির অন্যমনস্কতা লক্ষ করে বললাম, 'আপনার অন্য কোন চেনা লোকদের কাছে খোঁজ করুন, যাঁরা রায়চৌধুরীদেরও চিনতেন। তাঁদের কাছে ঠিকানা পেতে পারেন। আপনি কি আজই এলেন?'

— কাল রাত্রে। ষোলো বছর পর প্রথম এলাম দেরাদুন থেকে। আগে কিছুদিন কার্সিয়াং ছিলাম।

এরপর আর-কিছু জিজ্ঞেস করা উচিত কিনা বুঝতে না পেরে চুপ করে রইলাম। ভদ্রলোক নিজেই বললেন, 'আমার টি-বি হয়েছিল। বাঁচার কোন আশাই ছিলনা। অনেকের হয়তো ধারণা আমি মরেই গেছি। আমি কিন্তু এখন ভালো হয়ে গেছি, সম্পূর্ণ ভালো হয়ে গেছি!' — লোকটা শেষের কথাটা এমন ব্যগ্রভাবে বললেন যেন আমার বিশ্বাস করা না-করার ওপরে অনেক-কিছু নির্ভর করছে।

— দশবছর আগেই আমার প্রথম সেরে যায়। কিন্তু তখুনি আমি কলকাতায় ফিরে না-এসেই ওখানেই থেকে গিয়েছিলাম। শরীরটাও সারিয়ে ফেরার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু তারপর দুবার আমার রিলাপস করে রক্তবমি করতে-করতে আমার গলার স্বর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এখন সম্পূর্ণ সেরে গেছি। তিনবছর আগেই ডাক্তার আমাকে গ্যারান্টি দিয়েছিলেন যে, আমার আর হবেনা। তবু দীর্ঘ তিনবছর আমি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছি। আর-কোন উপসর্গ দেখা দেয়নি। এখন আমি সুস্থ, প্রায় আপনাদের মতোই স্বাভাবিক মানুষ। ভেবেছিলাম এদিকে আর ফিরবনা। ও-দিকেই থেকে যাব। কিন্তু—

— শেষপর্যন্ত কলকাতা টেনে আনলে।

— কলকাতায় আমার তেমন আকর্ষণ নেই। আমি চলে যাবার পর প্রথম দু-তিন বছর বন্ধু-বান্ধবরা খুব চিঠিপত্র দিত— তারপর আস্তে-আস্তে কমে

দাদা মারা গেছেন গত বছর। শুধু আকর্ষণ ছিল এই তেত্রিশ নম্বর বাড়ির। যখন সুস্থ হয়ে উঠলাম, তখন বারবার মনে পড়তে লাগল কৈশোর – প্রথম যৌবনে যখন আমি সুস্থ ছিলাম, সেই দিনগুলোর কথা। সেই সময়টা কেটেছে এই বাড়িতে। এ-বাড়িতে আমার বন্ধু অনিমেষ থাকত। আর ওর তিন বোন। লীলাদি, মায়া আর ছায়া। ওরা চার ভাইবোন ছিল কাছাকাছি বয়সের – সকলেই আমার বন্ধু। একটা আশ্চর্য কথা কী জানেন, তখন যে লাল শাড়িপরা একটি মেয়ে গেল – তাকে দেখে আমি বিষম চমকে গিয়েছিলাম। আচ্ছা মেয়েটিকে আপনিও দেখেছিলেন, না আমার চোখের ভ্রম?

– আমিও দেখেছি।

– আশ্চর্য। বিশ্বাস করুন, অবিকল অনিমেষের ছোট বোন ছায়ার মতো দেখতে। ঠিক সেইরকম মন্থর অহংকারী হাঁটার ভঙ্গি। অথচ ছায়া তো হতেই পারেনা, এতদিনে ছায়ার আরও ষোলো বছর বয়েস বেড়েছে। তাছাড়া ছায়া ও-রকম একা রাস্তায় বেরুতনা, সবসময় সঙ্গে চাকর বা দারোয়ান থাকত।

কী জানি, কী ভেবে হঠাৎ আমি বলে ফেললাম হয়তো আপনার দেরাদুনে থেকে যাওয়াই উচিত ছিল। না-ফিরলেই পারতেন।

লোকটি ঈষৎ অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন। তারপর আমার অনধিকার চর্চায় বিরক্ত না-হয়েই বললেন, 'ফিরব না-ই ভেবেছিলাম।'

কলকাতা থেকে যখন জ্বরে আচ্ছন্ন অবস্থায় চলে যাই, বিষম অভিমান নিয়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, এ-শহর আমাকে চায়না, আমিও আব এ-শহরের কাছে ফিবে আসবনা! কিন্তু কলকাতাকে মনে পড়ার একটা সাইকল আছে। পাঁচবছর পব-পব বিষম মন কেমন করে। গতবছর থেকেই ফেরার জন্য আমি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। ওখানে থাকতাম একা-একা। আলাদা একটা ঘর ভাড়া নিয়ে! কিন্তু একাকীত্ব মানুষকে ক্রমশ নির্বোধ করে দেয় – কবিরা যাই বলুক, একাকীত্বই আমাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। কিন্তু যদি জানতাম তেত্রিশ নম্বর বাড়িটা নেই—! জানেন, ঐ জায়গায় – ভদ্রলোক আমাকে আঙুল দিয়ে একটা শূন্যস্থান দেখিয়ে বললেন – ছিল সদর দরজা, তারপর একটা গলির মতন, পরে চাতাল, সেখানে একটা লম্বা কাঠের বেঞ্চ পাতা থাকত। ওখানে আমরা বসে রাস্তার মানুষ চলাচল দেখতাম; চোখে পড়ত উলটোদিকের পার্ক, ফুচকাওলাকে ডেকে নিয়ে যেতাম ভেতরে। অনিমেষ বাড়িতে না-থাকলেও আমি ওর বোনদের সঙ্গে বসে গল্প আর হাসিঠাট্টা করতাম। তখন আমি বুঝতে পারিনি, লীলা, ছায়া আর মায়া -এর মধ্যে কাকে আমি ভালোবাসতাম। পরে নির্জন প্রবাসে বসে অনেক

ভেবেছি, বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলাম, আর-একবার ঐ বাড়িতে ঢুকে কাঠের বেঞ্চিটায় বসতে পারলেই মনে পড়বে। কিন্তু—

একটুক্ষণ চুপ। ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেলে লোকটি বললে, 'যাক তবু বাড়িটা ভেঙে ফেলে এখন ও শূন্য মাঠ। আমি মাঠের মধ্যে বাড়িটা দেখতে পাচ্ছি কল্পনায়। কিন্তু এর বদলে যদি দেখতাম, চৌকো লম্বা দেশলাই-এর বাক্সের মতো, আধুনিক বিশ্রী একটা নতুন বাড়ি, তাহলে খুব খারাপ লাগত।

কথাবার্তা অত্যন্ত ব্যক্তিগত এবং সেন্টিমেন্টাল দিকে চলে যাচ্ছে দেখে আমি ঘোরাবার চেষ্টা করে বললাম, 'কলকাতা শহরের আর কী-কী বদল দেখলেন? আমাদের তো চোখে পড়েনা।'

—কলেজ স্ট্রিট! চেনাই যায়না। সিনেট হলের গম্ভীর থামগুলো আর প্রসন্নকুমার ঠাকুরের মূর্তিটাই নেই, সেখানেও উঠছে একটা দেশলাই-এর বাক্স-বাড়ি। কাল রাত্রের দিকে চৌরঙ্গি-অঞ্চলের দিকে ঘুরছিলাম, নতুন নিয়ন আলোয় এ-শহর সম্পূর্ণ অচেনা লাগছে আমার কাছে। কোন্ কোন জিনিশ বদলে গেছে আমি ঠিক বলতে পারবনা, কিন্তু বুঝতে পারছি অনেক-কিছু বদলে গেছে। অনেক, প্রায় একটা অন্য শহর।

আমি বললাম, 'বৌদ্ধ গাথায় আছে, এক নদীতে কেউ দুবার স্নান করতে পারেনা। নদীর নাম এক থাকলেও নদীর জল বদলে যাচ্ছে অনবরত। সেইরকম একবার চলে গেলে এক শহরে বোধহয় কেউ আর দ্বিতীয়বার ফিরে আসতে পারেনা। ফিরতে হয় অন্য শহরে।'

— হয়তো তাই। বুঝতে পারছি, এ-শহর আমার সে-চেনা শহর একটুও নয়। দেখি যদি রায়চৌধুরীদের ঠিকানা খুঁজে পাই। অনিমেষ আর ওর বোনদের সঙ্গে দেখা হলে হয়তো সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়বে।

বিদায় নেবার সময় আমি মনে-মনে ভাবলাম, অনিমেষ রায়চৌধুরী আর তার বোনদের সঙ্গে এই লোকটির আর দেখা না-হলেই বোধহয় ভালো হয়। সেই বাড়ির বদলে চৌকো দেশলাইয়ের বাক্সমার্কা বাড়ি দেখলে ভদ্রলোক যেমন দুঃখিত হতেন — সেই রায়চৌধুরীদের এখন দেখলে বোধহয় তার চেয়েও বেশি দুঃখিত হবেন। শহর আর কী বদলেছে, বদলেছে এ-শহরের মানুষ। মানুষের মুখ দেখে বুঝতে পারছেননা। এরকম নিস্পৃহ, কঠিন, তিক্ত, সেকেন্ড-ব্রাকেট-ভুরু মুখের মিছিল কী আগে ছিল এ-শহরে? যে-কোন মানুষের মুখ দেখলেই বুঝতে পারতেন। এমনকী আমার মুখ দেখেও।

২২

শুনেছি ফরাসি দেশে পাঁচশো ফ্রাঁর নোটের (ওল্ড ফ্রাঁ) একটা ডাকনাম আছে : মিজারেবল। অর্থাৎ যন্ত্রণা! কারণটি এই, শুনতে যদিও পাঁচশো টাকা, কিন্তু ওর দাম আসলে পাঁচ টাকা। অত বড় একখানা নোট, অত টাকার ছাপমারা — কিন্তু কিছুই কিনতে পারা যায়না বিশেষ। পকেটে হাত ঢুকিয়ে এরকম একটা পাঁচশো ফ্রাঁর নোট হঠাৎ বার করে খাঁটি প্যারিসিয়ান ঝংকার দিয়ে ওঠেন, 'ও, বন ফরতুন! ম্যার্দ! মিজারেবল! (অনুবাদ : ওঃ, এ যে দেখছি লাখ টাকা! গু-গোবর! যন্তোন্না!)

ঐরকম নাম পাঁচশো টাকার (অর্থাৎ বর্তমানের পাঁচ টাকার) নোটেরই ভাগ্যে পড়ার একটা অপ্রত্যক্ষ কারণ আছে। ফরাসি দেশই বোধহয় পৃথিবীর একমাত্র দেশ যেখানে — সাহিত্যিকদের ছবি ছাপা হয় টাকার নোটে। রাসিন, কর্নেই ভলতেয়ার, ভিক্টর উগোর ছবি আছে বিভিন্ন নোটে। পাঁচশো ওল্ড ফ্রাঁর নোটে। ভিক্টর উগোর ছবি। এবং উগোর বিখ্যাত বই 'লে মিজারেবল'-এর স্মৃতির ঐ পরিণতি জনতার মুখে-মুখে।

সে যাই হোক, সকলেই জানেন, ফরাসিরা স্বভাবতই অতিশয়োক্তিপরায়ণ। আমাদের দেশে কিন্তু পাঁচ টাকার অনেক দাম। সেজন্য, আচমকা চৌরঙ্গির বাসস্টপে দাঁড়িয়ে রাস্তা থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট কুড়িয়ে পেয়ে আমি ভীষণ খুশি হয়ে গেলাম। এই পাঁচ টাকায় আমি এখন একটা গোটা রাজ্য কিনতে পারি। কলকাতার পথে-ঘাটে টাকা-পয়সা ছড়ানো — এরকম প্রবাদ বহুদিন হল সারা ভারতবর্ষে প্রচলিত যেজন্য বিভিন্ন প্রদেশ থেকে দলে-দলে লোক কলকাতায় ছুটে এসেছে ভাগ্য ফেরাতে। কথাটা মিথ্যে কী, এখনো তো অনেক ধনী ব্যক্তির মড়া পোড়াতে নিয়ে যাবার সময় পথে-পথে খইয়ের সঙ্গে পয়সা ছড়ানো হয়। তবে এই পাঁচ টাকার নোটটি নিশ্চয়ই শ্মশানযাত্রীরা ছড়ায়নি। কোন অতিব্যস্ত লোকের পকেট থেকে পড়ে গেছে অসাবধানে। খাঁটি পরিষ্কার পাঁচ টাকা — জাল নয়, এমনকী, আজাদ হিন্দ ফৌজের টাকাও নয়। আমি বিনা দ্বিধায় তুলে নিলাম।

আগে নিতামনা। বাবা-মা, গুরুজনেরা এরকম একটা কুসংস্কার ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন যে, কুড়ানো পয়সা নিতে নেই। পয়সা কুড়িয়ে নিলে নাকি পকেট থেকে তার ডবল আবার বেরিয়ে যায়। অনেকদিন এই কুসংস্কারটা রক্ষা করেছিলাম — আমার চোখ বিশ্রী রকম ভালো বলে অনেক কিছু দেখতে পাই — নর্দমার পাশে চকচকে সিকিটাও চোখ এড়ায়না। কিন্তু কখনো তুলিনি। আমার সততার একটি উদাহরণ দিচ্ছি। একবার মৌলালি থেকে কলেজ স্ট্রিট যাবার খুব দ্রুত দরকার ছিল। নয়া পয়সার অত্যল্প আগের যুগ, পকেটে আমার একটি নিঃসঙ্গ

এক আনি, অথচ বাস ভাড়া সাত পয়সা। মৌলালি থেকে বৌবাজার সমান দূর, ওখান থেকে বাসের ভাড়া এক আনা। কিন্তু ওটুকু হেঁটে যাবার ধৈর্য ছিলনা, সময় ছিলনা —। সুতরাং ঠিক করেছিলাম, ঐ কয়েক স্টপ বাসের হ্যান্ডেল ধরে ঝুলতে-ঝুলতে কন্ডাক্টরকে ফাঁকি দিয়ে চলে যাব — তারপর বউবাজার থেকে টিকিট কাটালেই হবে। কিন্তু এমন নিরাশ হলাম — একটা বাস এল অস্বাভাবিক ফাঁকা। বিকেলবেলা ওরকম ফাঁকা বাস আসা অবিচার ছাড়া কী — যেখানে মানুষের হ্যান্ডেল ধরে ঝুলে যাবার সুযোগ নেই। অগত্যা মনমরা হয়ে ভিতরেই ঢুকতে হল — একটা বসবার পুরো জায়গা পেয়ে গেলাম পর্যন্ত, এবং দেখলাম, পায়ের কাছে একটা চকচকে আনি পড়ে আছে। তাড়াতাড়ি পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম, না, আমারটা ঠিক আছে, এই দ্বিতীয়টি ঈশ্বরপ্রেরিত। সুতরাং ঐ আনিটা তুলে নিয়ে সাত পয়সা ভাড়া দিলেই সব ঝঞ্ঝাট মিটে যায়। কিন্তু ঐ-যে আমার ধর্ম ও সততা বোধ, কুড়ানো পয়সা নেবনা। আমি পয়সাটাকে জুতোর তলায় চাপা দিয়ে রাখলাম — মতলবখানা এই যে, বউবাজার পেরিয়ে গেলে আমি ঐ পয়সাটা ব্যবহার না-করে আমার নিজস্ব এক আনারই টিকিট কাটব। আর তারসঙ্গে কন্ডাক্টর এলে — আমি পয়সাটাকে পা দিয়ে দূরে ঠেলে দিয়ে তাকে বলব, আমার পয়সাটা পড়ে গেছে, তুলে দিন তো। তাবপব ওর হাত দিয়েই তুলিয়ে, আমি না-ছুঁয়ে, টিকিট কাটব সাত পয়সার, উড়ো খই যাবে গোবিন্দের কাছে। কন্ডাক্টর দরজার মুখে দাঁড়িয়ে দন্তারবিন্দ-প্রস্ফুটিত করে তার পার্টনারের সঙ্গে গল্প করছে। যথারীতি বউবাজারে বাস পৌঁছুতেই হুড়মুড় করে উঠল বহু লোক — নতুন যাত্রী, পুরোনো যাত্রীরা মিশে গেল। কন্ডাক্টব পরে এসে আমাব টিকিট চাইতে আমি অম্লানবদনে কাটলাম এক আনার। তারপর পা সরিয়ে বললাম, এখানে কাব পযসা আছে, আপনি তুলে রাখুন।

এখন আব ওসব ভাবিনা। ঝট কবে পাচ টাকাটা তুলে নিলাম। পকেট থেকে ডবল বেবিয়ে যাবার সম্ভাবনা কবে ঘুচে গেছে। এখন পকেট খুবই শোচনীয় অ্যানিমিয়ায় ভুগছে। তাছাড়া পাচ-পাঁচটি টাকা, এই টাকা ইচ্ছে করলে সূর্যের আলো গাঢ় করে দিতে পাবে, সু-বাতাস বইয়ে দিতে পারে, আলো জ্বেলে দিতে পারে অন্ধকার ময়দানে। পাঁচ টাকা অর্থাৎ এখন পাঁচশো পয়সা — এই কথা ভাবলেই তো সংখ্যাতত্ত্বের এক আশ্চর্য ভোজবাজি ঘটে যায় — মনে হয় কী বিপুল এর পারচেজিং 'পাওয়ার'। পাঁচশো পয়সায় ফুচকা পাওয়া যাবে আড়াইশো — চিনেবাদাম অন্তত এক হাজার। ছোলা আজকাল কিনতে পাওয়া যায়না, নইলে তা-ও পাওয়া যেত তিন-চার হাজার। সারা মাসের খবরের কাগজ কিনে যাবতীয় সু-সংবাদ ভোগ করা যেতে পারে। অথবা চিড়িয়াখানা দেখতে যাওয়া যায়

কুড়িবার। কিংবা বাসে চাপা যায় অন্তত পঞ্চাশবার। এ-তো গেল শৌখিন ব্যবহারের কথা, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিশের জন্যও কীরকম কাজে লাগতে পারে। পাঁচশো পযসার গম পাওয়া যাবে তেরো হাজারটি, চাল একুশ হাজার। চিনি পাওয়া যেতে পারে তিন লক্ষ তিরিশ হাজার টুকরো। ভাবলে মাথা ঘুরে ওঠে। যদি গুলি সুতো কিনি, পাঁচশো পয়সায় সাড়ে চার মাইল লম্বা সুতো আসতে পারে আমার অধিকারে। পাটকাঠি কিনলে ঘরভর্তি পাটকাঠি। মোমবাতিও পাওয়া যেতে পারে অন্তত পঞ্চাশটা। স্কুলের ছাত্রদের যদি রচনা লিখতে দেওয়া হয়, তোমাকে পাঁচ-পাঁচশো পয়সা দিলে কী করবে — তাহলে তারা নিশ্চয়ই লিখবে — এই পয়সায় একটা নাইট স্কুল খুলে দেবে — কিংবা গ্রামে-গ্রামে বিদ্যুৎ এনে দেবে কিংবা কিনে ফেলবে ঘুড়ির দোকানের যাবতীয় ঘুড়ি।

ঐ বিপুল মুদ্রাব আর সদব্যবহার করা যায় একটি বই কিনে। যে-কোন বই নয় একটি পঞ্জিকা। পঞ্জিকা মেনে চললে সারা বৎসরের জন্য নিশ্চিন্ত। একাদশী অমাবস্যার উপবাস, যাত্রা নাস্তি, অশ্লেষা-মঘা, আজ অলাবুভক্ষণ নিষেধ, কাল বার্তাকু মানা, এই-এই দিন আমিষ বর্জন। এমন মনের সুখে দিন কাটাবার আর কী পথ আছে। ছেলেবেলায় আমাদের ইস্কুলেব দারোয়ানের মুখে যেমন তার আহার্যতালিকা শুনেছিলাম — ভাত, ভাত-সেদ্ধ আব ভাতের তরকাবি। সেইসঙ্গে নুন তো আছেই। অর্থাৎ চার-কোর্সের ডিনার। যেদিন খুব শৌখিনতা করার ইচ্ছে হত সেদিন মবিয়া হয়ে রাখত পুঁইশাকের দেখনাই। অর্থাৎ সকালবেলা পুঁইশাক রেঁধে সেটা না-খেয়ে, শুধু দেখে-দেখে খাওয়া। রাত্রিবেলা সত্যিকারের পুঁইশাকসমেত ভোজ।

দেখনাই প্রসঙ্গে ছেলেবেলার আর-একটি গল্প মনে পড়ল। পূর্ববঙ্গ থেকে কলিকাতায় আসবার পথে গোয়ালন্দের স্টিমারঘাটের হোটেলে গরম-গরম ইলিশমাছের ঝোল দিয়ে ঐশ্বরিক খাদ্য পেতাম ছপয়সায়। হোটেলে সাধারণের জন্য দুরকম রেট ছিল। ভাত, খেঁসারির ডাল ও বেগুন কুমড়োর তরকারি — এই নিরামিষ খাবারের জন্য তিন পয়সা। আর মাছের ঝোলসমেত ছপয়সা। আর-একটা বিশেষ রেটও ছিল। মাছের দেখনাই। অর্থাৎ নিরামিষের সঙ্গে একটা প্লেটে মাছও রেখে যাবে একটা, কিন্তু প্লেট থেকে মাছ না-ছুঁয়ে শুধু ঝোলটুকু ঢেলে নিয়ে, মাছটা দেখে-দেখে ভাত খাবার পর আবাব মাছটা ফেরত দিলে চার পয়সা। আমাদের পাশে এক পাইকার এসে খেতে বসে দেখনাই-এব অর্ডার দিয়েছে। পরম পরিতৃপ্তি সহকারে খেয়ে উঠে আবার মাছটা ফেরত দিয়ে ঢেকুর তুলে ম্যানেজারের কাছে দাম দিতে গেছে। গোয়ালন্দের ইলিশের তো ঝোলেই আদ্দেক স্বাদ। ম্যানেজার তাকে চার্জ করল পাঁচ পয়সা। পাইকার তো রেগেই অস্থির। একি

অন্যায় কথা, তার বেলা নতুন রেট, চার পয়সার জায়গায় পাঁচ পয়সা চাওয়া হচ্ছে তার কাছে। ম্যানেজার ঝিমুচ্ছিল, চোখ না-তুলেই বলল, ও হালার বাই হালা, দেহি নাই বুঝি! তুই যে চসছোস। (অনুবাদ : ওরে স্ত্রীর ভ্রাতাস্য ভ্রাতা, আমি বুঝি দেখিনি। তুই যে মাছটা চুষে নিলি একবার!)

বাসস্টপে দাঁড়িয়ে পাঁচশো পয়সার নোটখানির বিপুল সম্ভাবনার কথা ভেবে আমি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তখন মনে পড়ল, কিছুদিন আগে কাগজে একটি খবর বেরিয়েছিল যে, বীরভূম জেলার কোন চৌকিদার যেন এখনও দশটাকা মাইনে পায় মাসে। তাই নিয়ে খানিকটা টিপ্পনি আর হা-হুতাশ করা ছিল। কিন্তু কেন? ভেবে অবাক হলাম। দশ টাকা — একহাজার পয়সা কি কম হল নাকি। ওর থেকেই লোকটা কত পয়সা জমাচ্ছে, কে জানে!

২৩

আমার মামাতো বোনের স্বামীকে কেন যে আমি কোনদিন আর পছন্দ করতে পারবনা — সেকথা কারুকে খুলে বলতে পারবনা। কিছুদিন আগে বিয়ে হল, দেখতে খারাপ নয় ছেলেটি এবং তার চেয়েও বড় কথা, বেশ ভালো চাকরি করে, হাসিখুশি, দরাজ হাতে সিনেমা-থিয়েটার দেখাচ্ছে, অল্পবয়সী শ্যালক-শালিকাদের সঙ্গে প্রভূত ঠাট্টা-ইয়ার্কি এবং গুরুজনদের দেখলেই টিপঢাপ করে প্রণাম করা, অর্থাৎ নতুন জামাই হিসাবে ঠিক যে-রকম হওয়া উচিত। আমি সম্পর্কে গুরুজন, কিন্তু ভারিক্কি নই বলে বেশ-একটা মার্জিত রসিকতার সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায়। ছেলেটিকে অপছন্দ করার কোনই কারণ নেই আমার, বরং খুবই ভালো লাগার কথা। কিন্তু আমি ওকে দেখলেই এড়িয়ে যাই। পারতপক্ষে কথা বলিনা। যদিবা কথা বলতে হয় কখনো, মুখে হাসি থাকলেও, ভিতরে একটা অদ্ভুত ঝাঁঝ ও ঘৃণা মেশানো থাকে।

কারণ, আমি ওকে চিনতে পেরেছি। ও আমাকে চেনেনা, কিন্তু এ-বিয়ে হবার অনেক আগে ওকে আমি একবার মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য দেখেছিলাম। সেই থেকে, ওর মুখ আমার চিরকাল মনে থাকবে। ওকে না-ঘৃণা করে আমার উপায় নেই। অথচ সেকথা মনে করিয়ে দিয়ে ওকে এখন আর অভিযোগ করা যায়না।

বাসে বিষম ভিড় ছিল, বছর পাঁচেক আগের কথা। অসম্ভব গরম, অন্যলোকের ঘাম আমার গায়ে এসে লাগছে, পায়ের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে রকমারি জুতো। এক-একবার ঢেউয়ের মতো ধাক্কায় হেলে পড়ছি। হঠাৎ আমার

পাশের সীটের ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। তিনি এবার নামবেন, একটা জায়গা খালি হবে এবং সে-জায়গাটা আমারই সবচেয়ে কাছে। ভদ্রলোক বেরিয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করছি। হঠাৎ একটু দূর থেকে, দু-তিনজন লোকের পিঠ সরিয়ে একটা ব্যাগ-সুদ্ধ হাত এগিয়ে এল, ধপ্ করে ব্যাগটা রাখল সেই জায়গায়। যেন জায়গাটা রিজার্ভড হয়ে গেল। তারপর শরীর এঁকেবেঁকে, দুমড়িয়ে ঠেলেঠুলে একটি যুবক এসে ধপ্ করে সেই জায়গায় বসে পড়ল। বসেই অন্যদিকে তাকাল যাতে আমাদের সঙ্গে চোখাচোখি না-হয়। যুবকটির সেই চরম নির্লজ্জতায় আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। সুবেশ, সুদর্শন যুবকটি, এমন নয় যে শরীর অসুস্থ, শুধু একটু বসবার জন্য ঐরকম ঠেলেঠুলে জঘন্য অভদ্রতার পরিচয় দেবে — আমি কল্পনাও করতে পারিনি। আমি বিষম অপমানিত হলাম। আমার পাশে দাঁড়ানো আর-একটি লোক আমার দিকে সহানুভূতিসূচক হাসল বলে অপমানে আমার শরীর আরও জ্বলে গেল।

আমার অপমান বসতে না-পারার জন্য নয়। লোকটির অভদ্র ব্যবহারে। ও-লোকটা আমাদের ভদ্র হবার সুযোগ দিলনা। আমি ভিড়ের ট্রামে-বাসে কখনো বসিনা। বিশেষত যদি একা থাকি। যদি দৈবাৎ আমার সামনে কোন বসার জায়গা খালি হয়, আমি সেটার সামনে আগলে দাঁড়াই, তারপর তাকাই লোকের চুলের দিকে। দেখি, কার মাথার বেশি চুল পাকা। সেই বৃদ্ধ বা বৃদ্ধোপম লোকের দিকে চেয়ে গলায় এক রাজ্যের বিনয় ঢেলে বলি, আপনি বসুন। তারপর, না, না, সেকি, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, না তা কি হয়, হ্যাঁ আপনি বসুন, বেঁচে থাকো বাবা, আজকাল এরকম! লোকটিকে শেষপর্যন্ত বসিয়ে ছাড়ি। হাতের কাছে বৃদ্ধ না-পেলে, কোন স্ত্রীলোক বা বালককে। এই বিনয় বা ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে আমি গর্বোদ্ধত মুখে তাকিয়ে থাকি। বলা বাহুল্য, আমার উদারতার কথা এখানে লিখতে বসেছি, এতটা ক্যাড আমি নই। উদারতা নয়, ওটা আমার অহংকার। ঐ সীট-লোভী, শকুনের মতো জনতা — যাদের সবারই চোখ তখন ঐ একটি খালি সীটের দিকে — সেখানে আমি দাঁড়িয়ে অন্যরকম ব্যবহার করতে, সীট ছেড়ে দেবার উদারতা দেখাতে যে আনন্দ পাই, তার তুলনায় নিজে বসার পর সামান্য পশ্চাৎদেশের সুখ কিছুই না। তখন মনে হয়, ঐ সীটটার আমি মালিক, রাজা, যাকে ইচ্ছে বিলিয়ে দিতে পারি। মানুষের প্রতি দয়া দেখাতে পাবার সুযোগের মতো সুখের সুড়সুড়ি আর কিছুতে পাওয়া যায়না।

কিন্তু সেদিন ঐ যুবকটি ছিঁচকে চোরের মতো আগে থেকে ব্যাগ বাড়িয়ে জায়গাটা দখল করে নিতে, আমার অসম্ভব রাগ হয়। রাগ হয়, আমার ভদ্রতা দেখাতে না-পারার ক্ষোভে। তাছাড়া ঐ ছেলেটা, বা অন্য লোকেরা কী ভাবল,

আমিই ঐ জায়গাটায় বসার জন্য উৎসুক, লোভী ছিলাম? পাশের লোকটা, তবে আমার দিকে সমবেদনার হাসি হাসল কেন?

তখন, ঐ সীটে-বসা ছেলেটির মুখ দেখতে আমার খুব ইচ্ছে হয়। ব্যাগ হাতে নিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে সুবেশ যুবকটি বসে আছে। কিন্তু, আসলে সাধুবেশে একটি পাকা চোর। পরের জায়গা চুরি করে। ইতর, জোচ্চোর কোথাকার! তোমার মুখ না-দেখে আমি ছাড়ছিনা। তোমার মতো ঘৃণ্য চরিত্রের মানুষকে আমার সারাজীবন চিনে রাখা দরকার।

আমি মুখ নিচু করে সেই যুবকটিকে জিজ্ঞেস করি, 'এখন কটা বাজে?' ছেলেটি বোধহয় উৎকর্ণ হয়ে ছিল, নিজের অপরাধবোধে বোধহয় সজাগ হয়েছিল, কেউ কোন মন্তব্য করে কিনা। যদিও তাকিয়ে ছিল জানালা দিয়ে বাইরে, কিন্তু কান খাড়া ছিল বোধহয় এদিকে। আমার প্রশ্নে ধড়মড় করে নড়েচড়ে উঠে বলে, 'অ্যাঁ?'

— কটা বাজে?

— কী বলছেন?

— ক-টা বাজে, বলবেন দয়া করে? আমি চিবিয়ে-চিবিয়ে প্রশ্ন করি। যুবকটি অবাক হয়ে আমার কঠিন লোহার মতো মুখের দিকে তাকায়। বোধহয় একবার ভাবে যে, আমি অসম্ভব রেগে গেছি, ওর উঠে আমাকেই সীট ছেড়ে দেওয়া উচিত। তা যদি ও করত, অর্থাৎ আমাকে ও ওর নিজের মতো বা জনতার মতো সীট-লোভী মনে করে তা প্রকাশ করত, তাহলে আমি সেইমুহূর্তে বোধহয় ওকে মেরেই বসতাম! তার বদলে, ছেলেটি বসে থেকেই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে, ভ্যাবাচ্যাকা গলায় বলে, 'দশটা বাজতে দশ!' ততক্ষণ আমি ওর মুখেব দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি, ওর মুখের ছাঁচ তুলে নিই আমার মনে, ঐ মুখ আমাব চিরকাল মনে থাকবে, চিরকাল আমি ঘৃণা করব।

আমারই ভাগ্যের দোষে, সেই ছেলেটি হয়েছে আমাব মামাতো বোনের স্বামী। এখন দেখা যাচ্ছে, কী সুন্দর ভালো ছেলে। সবাই বলছে, হীরের টুকরো জামাই। সত্যিই অরুণার ভাগ্য বলতে হবে। আমিও ওর চরিত্রে কোন খুঁত দেখতে পাইনা, এমন মানানসই ব্যবহার, যেখানে ঠিক যেমন দরকার। কিন্তু সেই মুখ আমার মনে আছে, আমার কাছে বিষম ঘৃণ্য ঐ মুখ, দেখলেই আমি মুখ ফিরিয়ে নিই। অথচ ছেলেটির আমাকে নিশ্চয়ই মনে নেই, আমার সঙ্গে ওর ব্যবহার এত সহজ। অর্থাৎ বাসে ও বহুবার সীট চুরি করেছে, এখনো করে চলেছে বোধহয়, আমার সঙ্গে একটা ঘটনা ওর মনে থাকবে কী করে।

অথচ, একথা আমি কারুকে বলতে পারিনা। বললে, বাড়ির সবাই নিশ্চয়

হো-হো করে হেসে উঠবে। বলবে, আগ-বাড়িয়ে একটা খালি সীট পেয়ে বসেছিল, এটা আবার দোষের নাকি? তুমি বসতে পারনি, এইজন্য তোমার রাগ? আহা, তখন কি আর পুলকেশ জানত যে একদিন তুমি ওর গুরুজন হবে? তাহলে, নিশ্চয়ই তোমাকেই সীট ছেড়ে দিত। — এসব শুনে আমার মাথায় খুন চড়ে যাবে বলেই আমি কারুকে বলিনা। ওর বিরুদ্ধে আমার একমাত্র অভিযোগ, আমাকে দয়া দেখাবার সুযোগ না-দিয়ে ও কেন নিজেই আগে জায়গা জুড়ে বসেছিল? আমি হয়তো ওকেই বসতে অনুরোধ করতাম।

আহা, অরুণা সুখী হোক। কিন্তু অরুণার স্বামী পুলকেশকে আমি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারবনা — যতদিন-না ও নিজের মোটরগাড়ি কেনে। মোটরগাড়ি কিনলে একমাত্র তখনই হয়তো আমার মন থেকে ওর সীট চুরির অপবাদটা মুছে যাবে।

২৪

জীবনে একবারই মাত্র কিছুদিনের জন্য আমি একটা দামি কলম ব্যবহার করেছিলাম। একটি ১৮ কারেট সোনার নিব-দেওয়া শেফার্স কলম। আমার বাবা খুব-একটা উদার, মুক্তহস্ত পুরুষ ছিলেননা। বিশেষত ছেলেদের উপহার-টুপহার দেবার দিকে তার কোন ঝোঁক ছিলনা। কিন্তু সেবার আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষার আগে বাবা হঠাৎ দিলদরিয়াভাবে ঘোষণা করলেন, অনেকটা সর্বসমক্ষেই, যে আমি যদি একবারেই ম্যাট্রিক পাশ করতে পারি, তবে আমাকে তিনি একটা দামি কলম কিনে দেবেন। ওরকম আকস্মিক ঘোষণার কারণ, আমি ভেবে দেখেছি, তাঁর নিশ্চিত দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আমি কিছুতেই পাশ করতে পারবনা, আমি পাশ করলে বিশ্বসংসারে একজনও ফেল করবেনা সে-বছর, সুতরাং রীতিমতো উদারতা দেখাবার সুযোগে, তিনি ওরকম একটা দামি ঘোষণা করে ফেলেছিলেন। এবং তারপর থেকে, আমি দেরি করে বাড়ি ফিরলে বা দুপুরে সিনেমায় পালিয়ে গেলে কিংবা ইতিহাস-বই চাপা দিয়ে গোয়েন্দা-গল্প পড়ার সময় ধরা পড়লে — বাবা আর আমাকে বকুনি না-দিয়ে, মৃদু, রহস্যময় হাসি হেসে বলতেন, পাশ করলে আমি কিন্তু সত্যিই একটা কলম কিনে দিতাম।

অনেক অসম্ভব ব্যাপারই পৃথিবীতে ঘটে। আমার বন্ধুরা যদিও এখনো অনেকে বিশ্বাস করেনা, কিন্তু একথা সত্যিই, আমি কিন্তু ম্যাট্রিকটা অন্তত ঠিকই পাশ করেছিলাম এবং সেবার, ঐ প্রথম বারেই।

আমার পাশ করার খবরে বাবা বোধহয় খানিকটা বিমর্ষ হয়েই পড়েছিলেন। কয়েকদিন খুব মন-মরা অবস্থায় দেখেছি। এমনকী, অন্যের সঙ্গে আলাপ করতে শুনেছি পর্যন্ত, যে, আজকাল নাকি পরীক্ষা-টরিক্ষার স্ট্যান্ডার্ড এত নিচে নেমে গেছে, গোরু-গাধাও পাশ করে যায়! তাঁদের আমলে, যখন উইলসন সাহেব ছিলেন — ইত্যাদি।

যাই হোক, শেষপর্যন্ত একটা কলম কিনে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। শৌখিন, শেফার্স কলম। কলমটা আমি সবসময় পকেটে নিয়ে ঘুরতাম, বন্ধুবান্ধবের মধ্যে বসে গল্প-গুজব করার সময় অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে কলমটা পকেট থেকে বার করে হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতাম, কাগজে হিজিবিজি কাটতাম। আসল উদ্দেশ্য ছিল, কলমটা সকলকে দেখানো, আমি যে পরীক্ষায় পাশ করেছি তার নির্ঘাৎ প্রমাণ।

আমার জীবনের সেই একমাত্র শৌখিন কলম পকেটমার হয়ে যায় অল্পদিনের মধ্যেই। কিন্তু সেজন্য আমার দুঃখ হয়নি। আমার বাবার ধারণা ছিল, ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর যে মাস-তিনেক ছুটি থাকে, সেই সময়টাতেই অধিকাংশ ছেলে-মেয়ে বখে যায়। ইউনিভার্সিটির অত্যন্ত অন্যায় এতদিন ছুটি রাখা। ঐসময় ছেলেরা লেখাপড়া করেনা, অলস মাথা শয়তানের কারখানা, ঐসময়টাতেই প্রেম-ট্রেম করার দিকে মন যায়। এইসব কারণে, বাবা আমাকে ঠিকপথে রাখবার জন্য একটিও পয়সা হাতখরচ দিতেননা। তাছাড়া, ঐরকম দামি কলম কিনে দেবার পর আর অর্থব্যয়ে তাঁর একেবারেই মতি ছিলনা বোধহয়। এবং উনি বিশ্বাস করতেন যে, প্রেম-টেম করার সময় পয়সা খরচ করতে পেলে ছেলেরা বিড়ি-সিগারেটও খেতে শেখে, সুতরাং পয়সা না-পেলেই আর ওপথে যাবেনা। আমাকে তিনি ট্রামের একটা মাসিক টিকিট কিনে দিয়েছিলেন, যাতে আমি গাড়ি-ভাড়ার ছুতো করেও একটা পয়সা চাইতে না-পারি। কিন্তু আমার হাতে তখন বাজার করার ভার ছিল, এছাড়া রেশন আনা, — আমার খুব একটা দৈন্যদশা ছিলনা।

একদিন একটা ট্রাম-স্টপে দাঁড়িয়ে আছি। সদ্য দোতলা রঙিন বাস বেরিয়েছে তখন কলকাতায়, অথচ আমি তাতে উঠতে পারিনা — আমাকে ট্রামেই যেতে হয়। সেদিন একটা চমৎকার নীল রঙের বাস এসে থামল আমার সামনে, জানলার পাশে একটি মেয়ে বসে আছে। আহা কী রূপ, মনে হল বিশ্বসংসারে এর চেয়ে রূপসী মেয়ে আর নেই। আমি তৎক্ষণাৎ যেন বিশ্বসংসার ভুলে গেলাম! মনে হল, এই সুন্দরীকে আর-একটু সময় দেখতে না-পেলে আমার জীবনই বৃথা। ট্রামের টিকিট থাকা সত্ত্বেও আমি লাফ দিয়ে বাসে উঠলাম। ঠেলে-ঠুলে সেই সুন্দরীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। কিন্তু, বেশিক্ষণ মোহিত হবার সুযোগ পেলামনা, কারণ মেয়েটি তার পরের স্টপেই নেমে গেল। বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমি পকেটে

হাত দিলাম, দিয়েই চমকে উঠলাম, আমার বুকের মতো বুক-পকেটও ফাঁকা। পেনটা উধাও। ট্রামের টিকিট থাকা সত্ত্বেও বাসে ওঠার ঐ ফল। কিন্তু আমি দুঃখ করিনি। সুন্দরী নারীর জন্যে সেই প্রথম আমার আত্মত্যাগ।

জীবনে আমার পকেট মারা গেছেও সেই একবার। আর কখনো না। তার প্রধান কারণ অবশ্য, আমার পকেট স্বভাবতই ফাঁকা থাকে, কলম আর জোটেনি। কিন্তু পকেট মারা না-গেলেও একটি পকেটমারের সঙ্গে আমার খুব আলাপ হয়েছিল।

বিকেলবেলা ভিড়ের বাসে আসছি, শিয়ালদা পেরুবার পর, হঠাৎ আমার নাকের কাছটা একটু চুলকে উঠল। নাকটা চুলকোতে গিয়ে — কী যেন একটা ব্যাপারে আমার খুব অস্বস্তি লাগল। একটা কী যেন রহস্য। আমার একহাতে বাসের হ্যান্ডেল ধরা, একহাত নিজের পকেটে। তবে কোন হাতে আমি নাক চুলকোলাম? আমার তো তিনটে হাত হতে পারেনা। এই তো টের পাচ্ছি পকেটে নিজের সেই হাত, আর-একহাতে সত্যিই হ্যান্ডেল ধরে আছি, আর-একটা হাতে এই মাত্র নাক চুলকোলাম। তাহলে? আসল ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই আমি বিদ্যুৎগতিতে নাক চুলকোনো হাতটা দিয়ে পকেটের হাতটা চেপে ধরলাম। পকেটের মধ্যে দুটো হাতে খুব হুড়োহুড়ি হতে লাগল, কিন্তু, আমি প্রবলভাবে দৃঢ় মুষ্টিতে সেই হাতটা ধরে আছি। মুখে কিছু বলিনি। সেই হাতটা অনুসরণ করে, সেই হাতের মালিককে দেখলাম। আমারই পাশে দাঁড়ানো রোগা চেহারার একটি যুবক। আমার পকেটে কিছুই ছিলনা, কয়েকটা বাজে কাগজপত্র আর খুচরো পয়সা, কিন্তু সেই অনধিকার-প্রবেশকরা হাতটি আমি পকেটের মধ্যেই ধরে রেখেছি, এ-অবস্থায় একবার 'চোর', 'পকেটমার' বলে চেঁচিয়ে উঠলেই সবাই — বাসের সব-কটা লোক, ছেলেটাকে মেরে একেবারে ছাতু করে দেবে। যে-সব লোক কোনদিনও দুর্গাপুজো, কালীপুজো কিংবা রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে চাঁদা দেয়না, তারাও পকেটমারকে মারার সময় চাঁদা দিতে এগিয়ে আসে।

তখনও বজ্রমুষ্টিতে হাতটা ধরা, তাকিয়ে দেখি ছেলেটির চোখে বিষম মিনতি মাখানো। অর্থাৎ কিছু তো নিতে পারেনি, এই অবস্থায় ওকে যেন আমি আর মার না-খাইয়ে ছেড়ে দিই। আমি চোখ দিয়ে ওকে ভস্মসাৎ করলাম প্রায়। মুখে একটুও কথা হলনা। কিন্তু চোখে-চোখে আমাদের কথা হল কিছুক্ষণ। ছেলেটি চোখ দিয়ে আমার কাছে ক্ষমা চাইছে। আমি চোখ দিয়ে ওকে ধমকাচ্ছি। যে-কোন মুহূর্তে ওকে মার খাওয়াতে পারি। হঠাৎ দেখি ছেলেটির চোখ দিয়ে সত্যি-সত্যিই এক ফোঁটা জল গড়িয়ে এল। তখন হাসি পেল আমার। আমি বন্দী হাতটাকে মুক্তি দিলাম পকেট থেকে। ছোকরাটা সঙ্গে-সঙ্গে বাস থেকে নেমে গেল।

কিন্তু সেই যে ছেলেটির চোখে-চোখে এতক্ষণ তাকিয়েছিলাম, ফলে ছেলেটির মুখ আমার মনে আঁকা হয়ে গেল। সম্ভবত ওর মনেও আমার মুখ।

একদিন বাসে উঠতে যাচ্ছি, পাশ থেকে একজন বলে উঠল, 'ওঃ, আপনি এ-বাসে উঠছেন? থাক্, তাহলে আমি আর উঠবনা!' তাকিয়ে দেখি সেই পকেটমার ছেলেটা, আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। আমিও হাসলাম। আরও একদিন বাসের ভিড়ের মধ্যে ওর সঙ্গে আমার দেখা। এবারও ছেলেটা বলল, 'আমি নেমে যাচ্ছি স্যার, কিছু বলবেননা।' চট্ করে সত্যিই নেমে গেল।

তারপর থেকে ছেলেটার সঙ্গে প্রায়ই আমার দেখা হত। একদিন অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে গল্পও করেছিলাম। পকেটমারদের জীবনের সুখ-দুঃখের কথা কিছু শুনতে হয়েছিল। ওদের অভাব-অভিযোগ, ওদের প্রতি পুলিশের অবিচার। সেদিন একটা জিনিশ লক্ষ করেছিলাম, প্রত্যেকেরই যে-কোন ব্যাপারে নিজস্ব অনেক দাবি থাকে। ওর দাবি শুনে মনে হল, পকেটমার-সমাজেরও জীবিকার একটা প্রোটেক্শান দরকার, ওদের কাজের বোনাস ও ইনক্রিমেন্ট, এবং সাধারণ লোকের পকেটে যথেষ্ট টাকা থাকা ও মানুষজনের চরিত্র কিছুটা আপনভোলা ও উদাসীন করে দেওয়া — সরকারেরই দায়িত্ব। নইলে ওদের জীবিকা চলবে কী করে? এই যে, এখন বেশির ভাগ লোকের পকেটেই টাকা থাকেনা — এটা তো একটা নিশ্চিত সরকারি ষড়যন্ত্র, পকেরমারদের জব্দ ও বেকার করার জন্য।

আমি ছেলেটিকে বললাম, 'ওসব কথা থাক্। শুনেছি তোমাদের সারাদিনের সব রোজগার এক জায়গায় জড়ো হয়। তারপর পেন, ঘড়ি ইত্যাদি বিক্রি করার ব্যবস্থা হয় একসঙ্গে। ভাই, আমার একটা শেফার্স কলম চুরি গিয়েছিল বাসে। তোমাদেরই কারুর কাজ। সেটা আমায় ফেরত দিতে পার? আমি সেটার দাম দিতেও রাজি আছি। কিন্তু, ওটা আমার বাবার স্মৃতিচিহ্ন।'

— আপনার পেন? কবে গেছে?

— বছর তিন-চার আগে।

— ওঃ, অতদিন আগের জিনিশ পাবেননা। এরপর কিছু চুরি গেলে — আমায় বলবেন। আপনার জিনিশ আমি ঠিক ফেরত দিয়ে দেব।

— কিন্তু ওটাই দেখো-না চেষ্টা ক'রে। আমার কলমের গায়ে আমার নাম লেখা আছে। ওটা আমার বাবা দিয়েছিলেন। বাবা মারা গেছেন, তাই ওটা আমি রাখতে চাই।

— না স্যার, ওটা পাবার কোন চান্স নেই। আপনি অন্য কলম চান তো বলুন। খুব ভালো কলম এনে দেব — ঐ শেফার্সই।

— না না, সে দরকার নেই। তোমাদের কাছ থেকে কলম নিয়ে মরি আর-

কি! শেষে রাস্তায় কোন লোক নিজের কলমটা চিনতে পেরে...

— আপনার কলমটা কোথায় মারা গেছে?

— কলেজ স্ট্রিটে, এক শীতকালের সন্ধেবেলা।

— হুঁ, ওটা গগনলালের এলাকা। আচ্ছা, দেখব এখন গগনলালকে জিজ্ঞেস করে।

— দেখো-না, ওটা আমার খুব শখের!

— আপনি যাবেন গগনদার বাড়ি?

— আমি যাব? সে কি হে?

— হ্যাঁ স্যার, গগন আমাদের মতো নয়, রীতিমতো ভদ্দর লোক, বিরাট তিনতলা বাড়ি। তিনপুরুষ ধরে ওদের এই ব্যবসা। উনিই তো আমাদের সর্দার।

— যাঃ! তিনপুরুষ ধরে পকেটমারের ব্যবসা?

— বিশ্বাস করুন! বাড়িসুদ্ধু সকলের। আপনি যদি প্রতিজ্ঞা করেন, কারুকে বলবেননা, তবে আপনাকে আমি গগনদার বাড়িতে নিয়ে যেতে পারি। অবশ্য, পুলিশকে হাত করা আছে গগনদার!

সত্যরক্ষার খাতিরে আমি গগনলাল সামন্তের বাড়ির ঠিকানা জানালামনা। কিন্তু সেখানে গিয়েছিলাম। গগনলাল সামন্ত একটি মধ্যবয়স্ক ঘাড়-ছাঁটা লোক, দেখলে মনে হয় রাজনীতি করেন। আমাকে তিনি খুব-একটা পছন্দ করলেননা। আমার সঙ্গীর দিকে আড়চোখে বারবার ভ্রূকুটি করলেন। আমার সঙ্গী সারা দেহটা মুচড়ে অশেষ কৃতজ্ঞতার ভঙ্গিতে জানাতে লাগল, যে একদিন আমি ওর প্রাণ বাঁচিয়েছি, সেইজন্যই — মানে সামান্য একটা উপকার, কলমটা আমার বাবার স্মৃতি— ইত্যাদি।

গগনলাল বললেন, 'চারবছর আগের কলম পাবার কোন উপায় নেই। এরপর যদি আবার কোন' — ইত্যাদি। সেইসঙ্গে পকেটমারের সর্দার আমাকে একটি উপদেশও দিলেন, 'ট্রামে-বাসে সাবধান হয়ে চলাফেরা করাই ভালো, বুঝলেন!'

কথা হচ্ছিল বাড়ির সদর দরজায় দাঁড়িয়ে। এমন সময় হিলতোলা জুতোর টকটক শব্দ করতে-করতে একটি ঝলমলে পোশাক-পরা যুবতী বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে। একঝলক তার দিকে তাকিয়েই চারবছর আগের সেই সন্ধেবেলার স্মৃতি মনে পড়ল। হ্যাঁ, কোন সন্দেহ নেই, এই সেই বাসের মধ্যে জানালার ধারে বসে-থাকা সুন্দরীর মুখ। যা দেখে আমি মোহিত হয়েছিলাম। হ্যাঁ, নিশ্চিত, কোন সন্দেহ নেই। মেয়েটিকে দেখেই আমার মনে হল, আমার যদি আর-একটা কলম থাকত, আমি ওর পায়ে অর্ঘ্য দিতাম আবার।

২৫

আমি একটি অলীক শহরের অধিবাসী। যখন একা-একা পথ হেঁটে যাই, তখন আমি আমার ছায়ার মুখোমুখি থাকি, পাশাপাশি নয়। আমি ঠিক কোন্ দিকে যাব বুঝতে পারিনা, আমার ছায়া পথনির্দেশ করে। অনেকসময় বলে, রাস্তাটা বাঁদিকে বেঁকে গেছে, তোমার যাবার দরকার সামনে, কিন্তু তুমি এখন ডানদিকেই যাও। এমন অবাস্তব, অলীক, অভ্রপুষ্প, মায়া, দৃষ্টিবিভ্রম এই পথগুলি।

বস্তুত, যে-কোন বাস্তব শহরের রাস্তাই হওয়া উচিত সোজা। কখনও বাম-দক্ষিণে বেঁকে যাবেনা। রাস্তা তো আর নদী নয় যে, যে-কোন দিকে ঘুরে যাবার অধিকার আছে। নদী ইচ্ছেমতো যায়, ইচ্ছেমতো লুকোচুরি খেলে, নারী-শরীরের মতো প্রত্যেক বাঁকে-বাঁকে নতুন সৌন্দর্য দেখানো তাকে মানায় — কারণ খেয়ালিপনা প্রকৃতিরই ভূষণ। কিন্তু মানুষ যেখানে সম্মিলিতভাবে কাজ করে সেখানে খেয়ালিপনার কোন অবকাশ নেই — সেখানে শুধু কেজো, দরকারি, শ্রীহীন — সরকারি চিঠির ভাষা ও কাগজের মতো কঠোর ও কুৎসিত হওয়াই স্বাভাবিক। যেমন, নদী আঁকাবাঁকা হয়, কিন্তু মানুষের কাটা খাল হয় সোজা আর লম্বা। মঙ্গলগ্রহে কিংবা চাঁদে প্রথম মানুষের অস্তিত্বের কথা বিজ্ঞানীদের মনে আসে — যখন দূরবীনে কয়েকটা লম্বা-লম্বা খালের মতো দেখা গিয়েছিল। ওরকম সোজা বলেই মনে হয়েছিল — ওগুলো নদী নয়, প্রাকৃতিক নয়, প্রাণীর তৈরি। সেই নিয়মে, প্রতি শহরের পথ হওয়া উচিত চওড়া, সোজা, বিচার-বিভাগীয় তদন্তের মতো দীর্ঘ। তার বদলে আমার এই অলীক কলকাতা শহরে সব রাস্তাই কুটিল ও বক্র, মানুষের মনের মতো অলিগলি।

আরেকটি অদ্ভুত কাণ্ড এই শহরের বাড়িগুলি। এক-একটা বাড়ির দেয়াল এক-এক রঙের হয় কেন? বাড়ি চিনতেই পারিনা। এমন নানান রঙের বাড়ি হলে কি সহজে চেনা যায়! আমার কোন-একটা বাড়িতে যাবার দরকার হলে — আমি যে-কোন রাস্তায়, যে-কোন দিকে মোড় ঘুরে যে-কোন বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হই। দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলি, অমুক আছে? ঠিক কোন-না-কোন অমুক বেরিয়ে আসে। বাংলা ভাষায় দুটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শব্দ আছে, 'অমুক' আর 'ইয়ে', অধিকাংশ বাক্যালাপ আমি এই দুটি শব্দপ্রয়োগে সেরে ফেলি। কোন অসুবিধে হয়না। কিন্তু বাড়িগুলো নানা রঙের হওয়ার কোন যুক্তিই নেই। 'ঈশ্বর গ্রাম সৃষ্টি করেছেন, মানুষ সৃষ্টি করেছেন, আর মানুষ সৃষ্টি করেছে নগর।' তাহলে, মানুষের গড়া নগর ঈশ্বরের সৃষ্টির চেয়ে আলাদা হবেনা? লাল-নীল-হলুদ-গোলাপী কেন বাড়ির রং, ওসব তো ফুলের রং হয়, বাস্তব শহরের যে-কোন বা প্রতিটি বাড়ির রং হওয়া উচিত কালো, কালোই হওয়া উচিত সমস্ত মানবসমাজের রং। প্রকৃতির

একমাত্র কালো অঙ্গ তো যা দেখছি কয়লা, তাও থাকে মাটির নিচে, মানুষ সেগুলো ওপরে তুলেও পুড়িয়ে ছাই রং করে দিচ্ছে। সুতরাং, সমস্ত শহরের বাড়ির রং কালো করে দেওয়া উচিত আইন করে, কোন বাড়ি আর ময়লা দেখাবেনা, কুৎসিত দেখাবেনা, আলাদা দেখাবেনা। একমাত্র আলাদা রং, সাদা রঙের হোক দেবালয়গুলো — মন্দির মসজিদ চৈত্য গির্জা সিনাগগ্। দেবালয় আর মানুষের বাড়ির রং যদি এক হয়, তবে দেবালয়গুলো আলাদা করে-করে তৈরি করার দরকার কী? 'হৃদয়-মন্দির' শব্দটা যে আজকাল অপ্রচলিত হয়ে যাচ্ছে, তার কারণ হৃদয়ের কোন রং নেই, মানুষের দেহকে দেবতার আয়তন হিসেবে ভাবতে অনেক কষ্ট হয়, কেননা মানুষকে শুধু মানুষ হিশেবে চিনতেই বহু সময় কেটে যায়।

আঃ, কল্পনা করেও কত সুখ! যেদিন আমার শহর বাস্তব হয়ে উঠবে — প্রতিটি পথ পিচবাঁধানো চকচকে, যতদূর দৃষ্টি যায় সোজা — দুপাশের প্রাসাদসারি নিখুঁত কালো রঙের, কোথাও অন্য রঙের মলিনতা নেই — মাঝে-মাঝে দু-একটি শ্বেত-শুভ্র দেবালয় ছাড়া। প্রকৃতি জানে কীভাবে সুন্দরের দর্শন করতে হয়, মানুষ জানেনা। প্রকৃতি জানে, সুন্দর জিনিশ সবসময় দেখতে নেই, মাঝে-মাঝে চোখের আড়াল করতে হয় — পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যের আকর যে নারী — তাকেও অনবরত দেখলে পুরোনো ও মলিন হয়ে যায় — মানুষ তবুও নারীকে মলিন করে। আমি এই তত্ত্ব জেনে একটি বিশেষ নারীকে ঘনঘন দেখতে যাইনি। কিন্তু নারীও মলিনা হতে চায় — সে আমাকে ভুলে গিয়ে অপর ঘনঘন-আসা পুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠা হয়েছে। প্রকৃতির যেটুকু কালো রং, সেটুকু সৃষ্টির নয়, বিস্মৃতির, অর্থাৎ রাত্রি। প্রকৃতির যত সৌন্দর্য দিনেরবেলায় দেখায়, সেগুলো আবার আড়াল করে রাখে সারারাত। সেইজন্যই প্রকৃতি মলিন হয়না, হয়তো।

না, শুধু তাই নয়। রাত্রিবেলা চাঁদ ও তারাগুলো দেখার জন্য অমন চমৎকার অন্ধকার পটভূমিকা তৈরি করে। দিনের আলোয় যাঁরা চাঁদ দেখেছেন — তাঁরা জানেন, সে চাঁদ ব্যবসায়ীর লাল রঙের বাড়ির পাশে লাল রঙের মন্দিরের মতোই কুৎসিত দেখায়। শুভ্র দেবালয় দর্শনের জন্য শহরের প্রতিটি বাড়ি কালো না হলে চলেনা।

এই অলীক শহরের মানুষগুলোও এমন দুর্বোধ্য যে, আজ পর্যন্ত কারুকে একবিন্দু বুঝতে পারলামনা। একদা আমি দুটি লোকের সংলাপ শুনেছিলাম একটি জটিল রাস্তার মোড়ে। দুটি লাল ও বেগুনি রঙের মানুষ। বলা বাহুল্য, ওদের গায়ের রং লাল কিংবা বেগুনি ছিলনা, স্বাভাবিক মানুষের গায়ের রং যেমন হয়, ময়লা ঘোলাটে জলের মতো। কিন্তু ওদের একজন একটা কটকটে লাল রঙের র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে ছিল, বাকিজন বেগুনি রঙের স্যুট। ওদের দুজনের পোশাকই এমন

চড়া রঙের যে দেখলে প্রথমেই মনে হয় ওদের কোন নাম নেই — দুটি লাল ও বেগুনি রঙের মানুষ মাত্র। ওদের সংলাপ এইরকম : বেগুনি লালকে দেখে হন্তদন্ত হয়ে বলল, এই যে বাবলু, তোর সঙ্গে দেখা হয়ে ভালোই হল, তিরিশটা টাকা দে তো। — লাল একটু উদাসীন ভঙ্গিতে বলল, টাকা নেই তো ভাই।

— বাড়ি গিয়ে দিবি চল! আমার হঠাৎ বিশেষ দরকার পড়েছে!

— আমার বাড়িতেও টাকা নেই।

— মহা মুশকিল হল তো। আচ্ছা, তুই একটা চেক্ লিখে দে-না, আমি কাল দশটার মধ্যেই ভাঙিয়ে নেব এখন।

— আমার ব্যাঙ্ক চেক্-বই দেয়না।

— সেকী রে, তোর কোন ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট?

— ব্লাডব্যাঙ্কে।

আমি স্তম্ভিত হয়ে এই বাক্যালাপ শুনলাম। সারাদিনটা সেদিন আমার দুশ্চিন্তায় গেল — ওদের কথার মর্মার্থ বুঝতে না-পেরে নয়, অন্য কারণে, ওদের রং বুঝতে না-পেরে। যে-লোকের ব্লাডব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট তাকে দেখে লাল মানুষ মনে হতে পারে, কিন্তু যে ঋণ চাইছে সে বেগুনি কেন? কী যুক্তি থাকতে পারে এর? সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য এই কাণ্ডটি ওরা করে গেল আমার চোখের সামনে!

আরেকদিনও এরকম সংলাপ শুনেছিলাম আমি। সেদিন আমার মনে হয়েছিল — কোন বাস্তব শহরে চিড়িয়াখানা থাকা উচিত নয়। সম্পূর্ণ অবান্তর পাগলামি বলা যায়। একদিন আমার এই অলীক শহরের চিড়িয়াখানা দেখতে গিয়েছিলাম আমি — তখন শীতের মৌসুমি পাখি এসেছে। কিন্তু পাখি দেখার বদলে — হিংস্র জন্তু-জানোয়ারগুলো দেখার কৌতূহলই বেশি হল আমার — কারণ ওদের তো সহজে দেখতে পাইনা। একটি ঝোপের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, ঝোপের আড়ালের বেঞ্চি থেকে টুকরো সংলাপ কানে এল। একটি বিরক্তি ও ভয়-মিশ্রিত বালিকার চাপা কণ্ঠ, 'না, একী অসভ্যতা হচ্ছে, ছাড়ুন।'

গলার মধ্যে আস্ত পান্তুয়া ঢোকানো অবস্থার মতো স্বরে একটি পুরুষের উক্তি, 'একি লীলা, তুমি রাগ করছ!'

— না, সত্যি ভাল্লাগেনা। চলুন এবার যাই।

— একটু বসো! আমাকে বুঝি তোমার একটুও ভালো লাগেনা?

— ওসব কী কথা। আঃ না, চলুন।

— তোমাকে আমার এমন ভালো লাগে। সত্যি লীলা, তোমার মতন —

— একি একি! না আপনার সঙ্গে আমার আসাই উচিত হয়নি।

— আমাকে তুমি ভুল বুঝছ। আমি সত্যি তোমাকে এত —। তোমাকে কাছে

পাবার জন্য —

— ইস্, ছি-ছি-ছি। ছাড়ুন, ছাড়ুন, উঃ, দূর হয়ে যান! আমি একাই যেতে পারব। অসভ্য, জানোয়ার কোথাকার!

— হা-হা-হা। তুমি সত্যি রেগে যাচ্ছ —

আমার পায়ের নিচ দিয়ে দুটো শিকড় বেরিয়ে আমাকে মাটির সঙ্গে গেঁথে রেখেছিল। নইলে, আগেই আমি স্থানত্যাগ করতাম। কিন্তু পরেও বহুক্ষণ আমি ওখান থেকে নড়তে পারলামনা। ওই একদৃশ্যের বেতার নাটকটার জন্য নয়, ওরকম তো যেখানে-সেখানে আকছার ঘটছে, এমনকী বেতারেও ওরকম কুচ্ছিৎ নাটক শোনা যায় অসংখ্য। কিন্তু, আমি অনড় হয়ে ছিলাম, কারণ মেয়েটির 'জানোয়ার' বলার সঙ্গে-সঙ্গে লোকটির হা-হা করে হেসে ওঠার মধ্যে আমি অবিকল একটি হায়নার ডাক শুনতে পেয়েছিলাম। চিড়িয়াখানার রেলিংয়ের বাইরে, খোলামেলা মাঠে ঝোপের পাশে হায়নার ডাক শুনতে পাই। তাহলে আর চিড়িয়াখানায় ও-সব জানোয়ার পুষে লাভ কী? সেদিনই আমার উপলব্ধি হয়েছিল একথা যে, ক্লাইভ স্ট্রিট কেন রেলিং দিয়ে ঘিরে রাখেনি। ক্লাইভ স্ট্রিটে একদিন প্রকাশ্য দিনমানে আমি দুটি কুমীরকে পাশাপাশি বুকে হেঁটে যেতে দেখেছিলাম। তাদের দুজনেরই মাথায় পাগড়ি এবং হাতে গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগ। কুমীর দুটো গল্প করতে-করতে পাশের একটা গলির মধ্যে ঢুকে গেল। এবং একটা সর্ষের তেলের পুকুরে নেমে সাঁতার কাটতে লাগল।

কিন্তু এরসঙ্গে কিছুরই তুলনা হয়না সেই বৃদ্ধের। এই অলীক শহরের দুর্বোধ্যতম মানুষ। কাল রাত্রে।

আমার এক বন্ধু আমাকে একবার বলেছিল যে, যে-কোন অচেনা মেয়েকেই 'আপনাকে আগে অনেকবার দেখেছি' বললে খুব খুশি হয়। মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করার উপায় — এবং রোগ শুনলেই ওষুধের নাম বলা — পৃথিবীর যাবতীয় লোকের স্বভাব। যাই হোক, বন্ধুটির উপদেশমতো আমি একবার এক জনসম্মিলনীতে একটি অচেনা রূপসী যুবতীকে বলেছিলাম, আমায় চিনতে পারছ, ইন্দ্রাণী? কেমন আছ? — এর উত্তরে মেয়েটি বলে যে, সে আমাকে একটুও চিনতে পারেনি, তার নাম ইন্দ্রাণী নয় এবং আমাকে দেখার পরমুহূর্ত থেকে সে আর ভালো নেই। একটুও দমিত না-হয়ে আমি তবু বলেছিলাম — আমি তাকে বহুকাল ধরে চিনি, একজন্ম আগে থেকে, গতজন্মে তার নাম ছিল ইন্দ্রাণী। আমার মনে আছে, আমি জাতিস্মর! মেয়েটি এ-কথায়ও একটুও বিচলিত হয়নি, এবং এর পরবর্তী আখ্যান এখানে আর বিবৃত করার দরকার নেই — শুধু এটুকু বললেই হবে — সেদিনের স্মৃতি আমার পক্ষে সুখকর নয়।

কিন্তু, কাল রাত্রে আমি একজন সত্যিকারের জাতিস্মরেরই দেখা পেয়েছিলাম হয়তো। সন্ধের পর আকাশ-জোড়া মেঘ, আমি একা ছিলাম। এই শহরে আমার কোথাও যাবার জায়গা ছিলনা, কোন একটি মুখও মনে পড়েনি, যার কাছে গিয়ে নির্ভয়ে বলতে পারি, কতদিন তোমায় দেখিনি, তুমি কেমন আছ? মেঘলা আকাশের নিচে বোধহয় সব মানুষই নিজেকে খুব একা মনে করে, কারণ সে-সময় তার ছায়াও পড়েনা। একা থাকতে-থাকতে আমার মন বিষম ভারী হয়ে গেল। আমি রাস্তার মানুষদের মুখের দিকে চেয়ে রইলাম, এরা সন্ধেবেলায় কে কোথায় যায় বোঝা যায়না। কে এখনই বাড়ি থেকে বেরুল, কে বাড়ি ফিরে চলেছে — কে এইমাত্র একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা করে এলো, কে এখন দেখা করতে যাচ্ছে — এসব কিছুই কারুর মুখে লেখা নেই। এমনকী, একটা ফার্নিচারের দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে আয়নায় দেখতে পেলাম — আশ্চর্য, সব মানুষের মুখই আমার মতো দেখতে, কোন তফাত নেই। আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ময়দানের মধ্যে বহুক্ষণ হাটতে-হাঁটতে হঠাৎ থেমে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ি, একটু পরেই ঘুম আসে।

যখন ঘুম ভাঙে, তখনও বৃষ্টি আসেনি, বরং মেঘ কেটে জ্যোৎস্না উঠছে। নীল রঙের জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্নার রং এমন স্পষ্ট নীল রেখায় যে আমি অবাক হতে গিয়েও ভাবি — অভিসারে যাবার সময় রাধাও নিজেকে জ্যোৎস্নার সঙ্গে মিলিয়ে দেবার জন্য নীল রঙের শাড়ি পরত। ফলে, আমি জ্যোৎস্না থেকে অন্যমনস্ক হয়ে রেড রোড ধরে হাঁটতে শুরু করি। সেইসময় সেই জাতিস্মরের সঙ্গে আমার দেখা হয়। লোকটি বিশাল কৃষ্ণচূড়াগাছের সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে ছিল। অত রাত, প্রথমে আমি ভেবেছিলাম দুর্বৃত্ত। কিন্তু, লোকটি অতিশয় বৃদ্ধ। দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিটাও অস্বাভাবিক — গাছে হেলান দিয়ে বাহুতে মুখ ঢেকে। আমি কাছে এগিয়ে বলি, 'আপনার কি শরীর অসুস্থ লাগছে? আমি কোন সাহায্য করতে পারি?'

লোকটি আমার দিকে ভারী কাচের চশমার মধ্য দিয়ে তাকালেন। তারপর বললেন, 'না, আমি ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন তো?'

আমি একটু বিব্রত হয়ে বলি, 'ও আচ্ছা, বিরক্ত করলাম বলে ক্ষমা চাইছি। এত রাত্রে — এভাবে, সেইজন্যই —'

— আমি রোজ এখানে আসি। অনেক রাত পর্যন্ত থাকি। এই গাছটি আমার বন্ধু!

আমি একটু কাষ্ঠ হাসির চেষ্টা করে বলি, 'তা বটে, গাছপালা ছাড়া খাঁটি বন্ধু আজকাল পাওয়াই মুশকিল।'

— না, মানুষই মানুষের বন্ধু হয়। গাছ গাছের।

আমি চলে যাবার ভঙ্গিতে দু-একপা এগিয়েছিলাম, এবার লোকটির দিকে আবার ঘুরে তাকালাম। লোকটি আমার মুখের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে বললেন, 'যদি বলি, আমি আরজন্মে গাছ ছিলাম? আমার মনে আছে!'

আমি বললাম, 'যদি বলি' আর সত্যি-সত্যি বলার মধ্যে অনেক তফাত।

— সত্যিই আমি আগের জন্মে গাছ ছিলাম। এই গাছটার পাশে। এ তখন ছিল আমার বন্ধু। আমার ফুল থেকে মৌমাছি উড়ে গিয়ে ওর ফুলে বসত। আমি জাতিস্মর। আমার মনে আছে।

আমি এবার বৃদ্ধকে যা সন্দেহ করার তাই করি। একটু হেসে বললাম, 'তা নয়, আপনার আগের জন্মের কথা মনে আছে। কিন্তু এ-জন্মের সবকথা মনে আছে কি? যেমন আপনার নাম কী, বাড়ি কোথায়, আজ কী বার? কত তারিখ, এখন কটা বাজে — এইসব?'

লোকটি বললেন, 'সব জানি, সব মনে আছে। আর এও জানি, তুমি একটি অজ্ঞান ছোকরা। তোমার চোখ খুব খারাপ। তুমি অবিলম্বে চশমা নাও। নইলে হোঁচট খেয়ে মরবে!'

— আচ্ছা ধন্যবাদ, চলি এবার।

আমার ক্ষিদে পেয়েছিল, তাই একটু জোরে হাঁটতে থাকি। তারপর শর্টকাট করার জন্য রেড রোড ছেড়ে মাঠের মধ্যে নামার সঙ্গে-সঙ্গে একটা গর্তে পড়ে হোঁচট খেয়ে পা মুচকে পড়ে যাই। কিন্তু ব্যথার বদলে বিস্ময়ে কঁকিয়ে উঠি আমি। আশ্চর্য, বৃদ্ধ কী করে জানাল আমি হোঁচট খাব। অথবা, ও বলেছে বলেই আমি হোঁচট খেলাম। ইচ্ছে হল জাতিস্মর বৃদ্ধের কাছে ফিরে গিয়ে গাছের পাশে যদি বৃদ্ধকে দেখতে না-পাই, যদি অদৃশ্য হয়ে গিয়ে থাকে — তবে এই মধ্যরাত্রে শুধু-শুধু ভয় পেতে হবে আমাকে। অথবা, বুড়োটাকে সত্যিই ওখানে এখন দেখতে পেলে আমি এবার ভয় পাব — দেখতে না-পেলে বরং নিশ্চিত হতে পারি। কিন্তু, ঝুঁকি নিয়ে আমি আর ফিরে গেলামনা।

তাহলে, হোঁচট-খাওয়া সম্পর্কে বুড়োর কথা সত্যি হলে — আগের কথাগুলোও সত্যি। আমার চোখ খারাপ — এটা ওই বুড়ো পুরু কাচের চশমা দিয়ে দেখতে পেল! আমার দেখার ভঙ্গি খারাপ, অনেকেই বলেছে, আমি মানতে চাইনা, আমি বলি, আমি বিশেষভাবে দেখি। সে যাই হোক, আমার আই-সাইট অত্যন্ত ভালো — আমি এক মাইল দূর থেকে কোন বন্ধুর পকেটের দশ টাকার নোট দেখতে পাই — এত শক্তিশালী আমার দৃষ্টিশক্তি, অথচ, আমার চোখের দেখা খারাপ, সেটাকে স্বাভাবিক করার জন্য আমাকে চশমা নিতে হবে — তবে

আমি হোঁচট খাবনা — এ-কথা আমাকে বলে এক চশমা-পরা জাতিস্মর — যুক্তির জালে আমি বিহ্বল হয়ে পড়ি। দূরে, শহরের সবকটা বাড়ির রং এখন কালো দেখাচ্ছে।

জ্যোৎস্নায় আমার একটা ছোট্ট ছায়া পড়েছে। সেই দিকে তাকিয়ে আমি টুকরো হেসে নিচু গলায় বলি, থাক্, যথেষ্ট হয়েছে। নীললোহিত, আর তুমি 'বিশেষ দ্রষ্টব্য' লিখোনা।
